Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফসানা মিমি

রোলঃ 228020308


২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### রিসার্চের বিষয়ঃ

## ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফসানা মিমি

রোলঃ 228020308

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফসানা মিমি, আইডিঃ 228020308 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আফসানা মিমি

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

**আফসানা মিমি**

আইডিঃ 228020308

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র

# ভূমিকা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ.

মহান আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন (সূরা-আলে ইমরান ১৯)।

আর এই দ্বীনে মহান আল্লাহ নারীর মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। নর-নারীর সমন্বয়েই মানব জাতি। নারী জাতি হলো মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। আল্লাহ তা'আলা নারীকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হিসেবে মানব জীবন পরিচালনার জন্য পারস্পরিক সহযোগী করেছেন। ইসলাম মর্যাদার দিক দিয়ে নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন করে দেখেনি। বরং ইসলামের আগমনেই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে মুক্তির সন্ধান। সারা দুনিয়াতে যখন নারীরা নিদারুণ অবস্থায় কালাতিপাত করছিল, আরব, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ার বলে মনে করা হতো এবং মানুষ হিসাবে তাদের কোন মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা হতো না, তখন ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক(সূরা বাক্বারা-১৮৭)

তিনি আরো বলেন,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

হে লোক সকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার অসিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে (নিজেদের হক) চেয়ে থাক। এবং আত্মীয়দের (অধিকার খর্ব করা)কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (সূরা নিসা-১)

জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ জীবিকার জন্য ঘাম ঝরানো এবং উপার্জনের জন্য দৌড়ঝাঁপ করা। ইসলাম নারীসমাজের প্রতি অনেক বড় একটি ইহসান এই করেছে যে, তার নিজের এবং পরিবারের অন্যসবার জীবিকা থেকে এবং যাবতীয় অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব থেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দান করেছে এবং তা পুরুষের কাঁধে অর্পণ করেছে। এটা কন্যা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে এবং সন্তানের মা হিসাবে বাবার কাছে, স্বামীর কাছে এবং সন্তানের পিতার কাছে নারীর অধিকার ও প্রাপ্য। মানবসমাজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য এবং সবচেয়ে বড় কথা, আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত খেলাফতের দায়িত্ব বহন করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টকর যে দায়িত্ব তা হলো সন্তান ধারণ ও সন্তান প্রসব। আল্লাহ এজন্য পুরুষের পরিবর্তে নারীকে নির্বাচন করেছেন এবং নারীর দেহসত্তা ও মানসসত্তাকে সেভাবেই তৈরী করেছেন। তারপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানের শারীরিক ও মানসিক প্রতিপালন, তার শিক্ষা, দীক্ষা, নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন। দুনিয়ার মানুষ গর্ব করে বলে, আজকের শিশু আগামী দিনের আদর্শ নাগরিক। আমরা বলি, আজকের শিশু হলো আগামী দিনের আদর্শ মা, আদর্শ বাবা এবং আলিমে দ্বীন, দাঈ ইলাল্লাহ ও মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। এখানেও নারীর ভূমিকাই বড়। এজন্যই ইসলাম নারীকে জীবিকার দৌড়ঝাঁপ থেকে এবং সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যেন সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব স্বস্তির সঙ্গে, নিরাপত্তার সঙ্গে এবং মর্যাদার সঙ্গে পালন করে যেতে পারে। পুরুষের কর্তব্য নারীর এই ত্যাগ ও কুরবানিকে কৃতজ্ঞচিত্তে মূল্যায়ন করা এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নারীর অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব কৃতার্থতার সঙ্গে পালন করে যাও। কিন্তু বাস্তবতা এইযে সর্বযুগেই নারীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে পুরুষ। এই কারণেই নারীকে নিয়ে এতো বেশি আলোচনা। নারীকে কীভাবে রাখতে হবে। কীভাবে পরিচালনা করতে হবে, কি হবে সমাজে নারীর অবস্থান এ নিয়েই সব আলোচনা। এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে বিভিন্নজন বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে পুরুষরা নারীকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফায়দা লুটার চেষ্টা করেছে। এই ফায়দা লুটার লালসাকে সামনে রেখে পুরুষের বিরাট একটা অংশ নারীকে তাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টির অভিপ্রায়কে কেন্দ্র করে নারীর অবস্থান নির্ণয় করেছে। আধুনিক বিশ্বের এই আধুনিক সময়েও অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি আলোচনা ও লেখালেখি হচ্ছে নারীকে নিয়ে। বিভিন্নজন বিভিন্ন ভাবে নারীর সমাজিক অবস্থান ব্যাখ্যা করছেন, এবং যার যার পক্ষে হাজারো যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করছেন। যে কারণে নারীরা আজ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। নারীর সামাজিক অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। একই কারণে কোনো কোনো নারীর সামাজিক অবস্থান হচ্ছে অপমানের লাঞ্চনার, কোনো কোনো নারীর অবস্থান হচ্ছে পুরুষের খেলনা

মাত্র, কারো অবস্থান পুরুষের যেমন ইচ্ছা তেমন উপভোগের সামগ্রী মাত্র, কারো অবস্থান পুরুষের আনন্দ দান ইত্যাদি।

## আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজে নারীদের অবস্থান ও তাদের প্রতি ইসলামের অনুগ্রহ :

আরবি ভাষায় 'আইয়াম' শব্দের অর্থ যুগ বা সময় এবং 'জাহেলিয়া' অর্থ অন্ধকার যুগ, কুসংস্কার, অজ্ঞাত ইত্যাদি। সুতরাং আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে অজ্ঞতার যুগ বা অন্ধকার যুগ বুঝায়।

আইয়ামে জাহেলিয়া (যার অর্থ "অজ্ঞতার দিন") হচ্ছে ইসলামের আগের যুগ, বিশেষ করে আরব উপদ্বীপে ইসলাম প্রবর্তনের আগে যে সময় ছিল, সেই সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা। এই সময়ের মধ্যে নারীকে সমাজে অত্যন্ত নীচু মর্যাদা দেওয়া হত এবংতাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক।

আরবদের ইতিহাস হলো, তারা নিজেদের আত্মমর্যাদা ও ইজ্জত সম্মানের দিকটি অধিক বিবেচনা করার কারণে, তাদের নারীদের প্রতি কোনো প্রকার অশুভ ও অসম্মানজনক আচরণ হতে পারে এ আশঙ্কায় তারা তাদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করে ফেলত। বিশেষ করে, তাদের মধ্যে যারা সম্ভ্রান্ত পরিবার বলে পরিচিত ছিল, তারা তাদের সম্মান ও মর্যাদাহানিকে কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারত না। তাই তারা মনে করত, তাদের নিকট কন্যা সন্তানদের হত্যার কোনো বিকল্প নাই। অন্যথায় তাদের পদে পদে অসম্মান হতে হবে। তাদেরই এক শ্রেণির লোক এমন ছিল, যাদের নিকট তুলনামূলক

কিছুটা হলেও নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করার প্রচলন ছিল; কিন্তু এ অবস্থাও বিভিন্নভাবে নারীদের অধিকারকে ঘোলাটে করে ফেলত এবং তাদেরকে তাদের মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত করা হত। ফলে এক কথায় বলা চলে তৎকালীন আরব সমাজে নারীর অধিকার বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। প্রতিনিয়তই তাদের ইজ্জত ও সম্মান লুণ্ঠিত হত এবং তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হত। জাহেলিয়াতের যুগে নারীদেরকে তাদের উত্তরাধিকারী সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হত। তাদেরকে সাধারণত কোনো সম্পদের মালিক করা হত না, যার কারণে জাহেলিয়াতের যুগে আরবের নারীদের মালিকানা বলতে কিছুই ছিল না।তৎকালীন আরব সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন বসবাস করত। অবস্থা এবং অবস্থানের কথা বিবেচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে।অভিজাত পরিবারের মহিলাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মান সম্মান

অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। মহিলাদের মান মর্যাদার ব্যাপারে হানিকর বা অবমাননাকর পরিস্থিতিতে সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার কোষমুক্ত হয়ে খুন-খারাবি শুরু হয়ে যেত। এক দিকে যখন সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত পরিবারসমূহের জন্য প্রচলিত ছিল এ ব্যবস্থা, অপরপক্ষে এ যুগে আরবরা নিম্নশ্রেণীর  নারীদের অস্থাবর সম্পত্তি ও ভোগের সামগ্রী বলে মনে করতো এবং তাদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত।তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে নারী পুরুষের সম্পর্ক এবং মেলামেশার ক্ষেত্রে এমন সব ঘৃণ্য ব্যবস্থা এবং জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল যাকে অশ্লীলতা, পাশবিকতা এবং ব্যভিচার ছাড়া অন্য কিছুই বলা যেতে পারে না।

জাহেলিয়াতের যুগে স্বামীর তালাক  অথবা মৃত্যুর পর তার পছন্দানুযায়ী অপর কোনো পুরুষের নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নারীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। ফলে একজন নারী তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামীহারা হলে তাকে অসহনীয় যন্ত্রণা ও সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হত এবং তাকে বাধ্য হয়ে অতি কষ্টে কালাতিপাত ও জীবন-যাপন করতে হত।

কিন্তু ইসলাম নারীদের এ দুর্ভোগের প্রতিকার করে

তাদের লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার হাত থেকে উদ্ধার করেছে। ইসলাম তাদের পুনরায় নতুন জীবন শুরু করার সুযোগ করে দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছবে তখন তোমরা তাদেরকে বাধা দিয়ো না যে, তারা তাদের স্বামীদেরকে বিয়ে করবে যদি তারা পরস্পরে তাদের মধ্যে বিধি মোতাবেক সম্মত হয়। এটা উপদেশ তাকে দেয়া হচ্ছে, যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এটি তোমাদের জন্য অধিক শুদ্ধ ও অধিক পবিত্র। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।(সূরা বাক্বারা-২৩২)

জাহেলিয়াতের যুগে নারীরা তাদের নিজদের ধন-সম্পদ নিজেরা ভোগ করতে পারত না। তাদের সম্পত্তিতে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। ফলে তারা ইচ্ছা করলেও তাতে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারত না।মোহরানা হিসেবে তাদের যে টাকা (অর্থ কড়ি) দেওয়া হত, তাও স্বামীরা তাদের থেকে আত্মসাৎ করে নিয়ে নিত। তারা নারীদের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপ করত ও তাদের ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে তাদেরকে গৃহাভ্যন্তরে আটক করে রাখত ফলে তারা অন্য কোনো স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত না।কিন্তু ইসলাম আসার পর নারীদের ওপর এ ধরণের অবৈধ হস্তক্ষেপ ও অনধিকার চর্চা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়।নারীরা

তাদের সম্পত্তিতে তাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করা এবং পছন্দমত বিবাহ করার অধিকার ফিরে পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ ج بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيرًا

হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিছ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না, তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেয়ার জন্য, তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন।(সূরা নিসা-১৯)

আর জাহেলিয়াতের যুগে কিছু কিছু খাবার এমন ছিল, যা শুধু পুরুষরা খেতে পারত নারীরা খেতে পারত না।নারীদের জন্য তা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম। আল্লাহতাদের এ ধরণের বৈষম্যের সমালোচনা করে বলেন,

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ ج يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

আর তারা বলে, 'এই চতুষ্পদ জন্তুগুলোর পেটে যা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম। আর যদি তা মৃত হয়, তবে তারা সবাই তাতে শরীক'। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের কথার প্রতিদান দেবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী। [সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১৩৯]

এ ছাড়াও তাদের বিবাহ করার কোনো নির্ধারিত সংখ্যা ছিল না। তারা তাদের ইচ্ছামত একাধিক বিবাহ করতএবং দুই বোনকে একত্রে এক সাথে বিবাহ করা তাদের সমাজে নিষিদ্ধ ছিল না। ইসলামের আগমনের পর দুবোনকে একত্র করা এবং এক সাথে চারের অধিক বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়। যার ফলে পুরুষদের জন্য যা ইচ্ছা তা করার যে একটা প্রবণতা তাদের সমাজে অব্যাহত ছিল, তা একটি নিয়মনীতি আওতায় চলে আসে নারীদের দুশ্চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَ أَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْأُخْتِ وَأَمَّهٰتُكُمُ الّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَابِكُمْ وَ رَبَابِبُكُمُ الّٰتِي فِي حُجُورِكُ مِنْ نِسَابِكُمُ الّٰتِي دَخَلْتُ مِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُ مِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَا بِلُ أَبْنَابِكُمُ لا الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদেরকে, তোমাদের মেয়েদেরকে, তোমাদের বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুদেরকে, তোমাদের খালাদেরকে, ভাতিজীদেরকে, ভাগ্নীদেরকে, তোমাদের সে সব মাতাকে যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোনদেরকে, তোমাদের শ্বাশুড়ীদেরকে, তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছ সেসব স্ত্রীর অপর স্বামী থেকে যেসব কন্যা তোমাদের কোলে রয়েছে তাদেরকে, আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলিত না হয়ে থাক তবে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে এবং দুই বোনকে একত্র করা (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে)। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আন-নিসা,আয়াত: ২৩]

তাদের মধ্যে আরেকটি বর্বরতা ও কুসংস্কার বিরাজ করছিল যে, পিতা তার স্ত্রীদের তালাক দিলে, অথবা মারা গেলে সন্তানরা পিতার স্ত্রীদের বিবাহ করতে পারত। এ ধরণের মানবতা বিরোধী ও ঘৃণিত কাজটি করতে তাদের সমাজে কোনো অপরাধ ছিল না এবং তারা কোনো প্রকার দ্বিধা বোধ ও করতো না। তবে ইসলামের আগমনের পর আল্লাহ তা'আলা এ ধরণের নিন্দিত ও ঘৃণিত কাজটিকে চিরতরে রহিত করে দেন এবং হারাম ঘোষণা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
ع وَسَاءَ سَبِيلًا

আর তোমরা বিবাহ করো না নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে বিবাহ করেছে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ। তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে (তা ক্ষমা করা হল)। নিশ্চয় তা হল অশ্লীলতা ও ঘৃণিত বিষয় এবং নিকৃষ্ট পথ।[সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২২]

জাহেলিয়াতের যুগে জীবজন্তু ও ধন সম্পদ যেভাবে মিরাসের সম্পত্তি হওয়ার যোগ্য অনুরূপভাবে নারীরাওধন সম্পদের মত মিরাসের সম্পত্তি রূপে পরিগণিত হত।আব্দুল্লাহ

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরবদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের কারো পিতা মারা গেলে অথবা তার সহযোগী কেউ মারা গেলে, তার স্ত্রীর ওপর কর্তৃত্ব অন্যদের তুলনায় তারই বেশি হত। সে ইচ্ছা করলে তাকে আটকে রাখতে পারত অথবা তার মোহরানা বা ধন-সম্পত্তি দ্বারা মুক্তিপণ না দেওয়া পর্যন্ত তাকে করায়ত্ত করে রাখতে পারত অথবা তার মৃত্যু পর্যন্ত ধরে রাখতে পারত। আর যখন মারা যায় তখন সে তার ধন-সম্পদসহ যাবতীয় সবকিছুর মালিক হত।

আতা ইবন আবি রাবাহ বলেন, জাহেলিয়্যাতের যুগে যদি কোনো মানুষ মারা যেত, তখন তাদের মধ্যে কোনো ছোট বাচ্চা থাকলে, তার লালন-পালনের জন্য তার পরিবারের লোকেরা স্ত্রী টিকে আটক করে রাখত। অন্য কোথাও বিবাহ বসার অনুমতি দিত না।

আল্লামা সুন্দী রহ. বলেন, জাহেলিয়্যাতের যুগে পিতা, ভাই বা ছেলে মারা যাওয়ার পর, মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের থেকে যে সর্বাগ্রে তার উপর স্বীয় চাদর রাখতে পারত, সেই তার স্বামীর দেওয়া মোহরের বিনিময়ে তাকে বিবাহ করা অথবা অপরের নিকট বিবাহ দিয়ে তার মোহরের মালিক হওয়ার সর্বাধিক বেশি হকদার। আর যদি মহিলাটি তার উপর কাপড় ফেলার পূর্বে সে তার পরিবারের নিকট চলে যায়, তাহলে সে নিজেই তার নিজের যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাখত। একটু ভেবে দেখুন কি এক অদ্ভুত ছিল তাদের জীবন ব্যবস্থা ও সামাজিক রীতিনীতি। বিশেষ করে তাদের নারীদের জীবন ব্যবস্থা ও তাদের জন্য আরোপিত আইন কানুন।

জাহেলিয়াতের যুগে তালাকের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল না। যে যত পারত সে তার স্ত্রীদের ততই তালাক দিত পারত। কিন্তু ইসলাম তালাককে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তালাকের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়। সুতরাং এখন আর নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত তালাক দেওয়া ও নারীদের নিয়ে তামাশা করার যাবতীয় পথ বন্ধ করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الطَّلَاقُ مَرَّتَنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ الَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا ج تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ

"তালাক দুইবার। অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু নিয়ে নেবে। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা করে যে, আল্লাহর সীমারেখায় তারা অবস্থান করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী যা দিয়ে নিজকে মুক্ত করে নেবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। এটা আল্লাহর

সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যে আল্লাহর সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করে, বস্তুত তারাই যালিম।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২৯)

জাহেলিয়াতের যুগে আরবদের কন্যা সন্তানদের প্রতি এতই অনীহা ছিল যে, তারা তাদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করতেও কোনো প্রকার কুণ্ঠাবোধ করত না। অনেক আরব পিতারা কন্যা সন্তানদের নিজ হাতে হত্যা করে নিজেদের কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করত। এ ধরণের ঘটনা তাদের সমাজে ছিল অসংখ্য।তাদের সামাজিক অবয়ের এহেন নাজুক মুহূর্তেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। ইসলাম তাদের সামাজিক অবক্ষয়ের মূলোৎপাটন করে এবং তাদের আলোর পথের সন্ধান দেয়। আরববা বিভিন্ন কারণে তাদের সন্তানদের হত্যা করত। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কারণে তাদের কন্যা

সন্তানদের হত্যা করত।অপমান ও আত্ম-মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় তারা তাদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করত।

আবার তাদের মধ্যে কতক এমন ছিল, যারা তাদের কন্যা সন্তানের কান-নাক কাটা, অত্যধিক কালো, অন্ধ, খোঁড়া, বোবা ও বধির হওয়ার কারণে হত্যা করত। কারণ, তারা মনে করত এ সব দোষ তাদের জন্য দুর্ভোগ বয়েআনবে।

কখনো কখনো কোনো কারণ ছাড়াই তারা অত্যন্ত পাষাণ নির্দয় হয়ে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করত অথবা জীবন্ত গোরস্থ করত। এতে তারা অত্যন্ত পাষণ্ড হৃদয়ের পরিচয় দিত তাদের মধ্যে কোনো দয়া-মায়া বলতে কিছুই ছিল না। এহেন গর্হিত কাজটি করতে তাদের বিবেক তাদের কোনো বাধা দিত না।

আবার কখনো তার পিতা দেশের বাইরে বা কোনো কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে হত্যা করতে পারত না। ফলে সে যখন বাড়িতে আসত, তখন তাকে হত্যা করত। এতে দেখা যেত সে বড় হয়ে গেছে এবং সব কিছু বুঝে; তারপরও তারা তাকে হত্যা করত। বড় হয়ে যাওয়া ও সব কিছু বুঝতে পারা ইত্যাদি কোনো কিছুই এ সব পাষণ্ডদের এ অমানবিক কাজ থেকে বিরত রাখতে পারত

এ বিষয়ে পরবর্তীতে তাদের অনেকেই নিজদের জীবনের একাধিক হৃদয়বিদারক ঘটনার একাধিক বর্ণনা দিয়েছেন।আবার তাদের অনেকে এমন আছে, যারা তাদের কন্যা সন্তানদের পাহাড়, ঘরের ছাদ অথব্য অন্য কোনো উঁচু স্থান থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করত।

প্রাক-ইসলামি যুগে কন্যা সন্তান জন্মদান অভিশাপ হিসেবে বিবেচিত হতো।আরবরা কন্যা সন্তানের জন্মকে অপছন্দ করত। তাদের কেউ মেয়েকে জ্যান্ত দাফন করত যেন মাটির নিচে তার মৃত্যু ঘটে। আবার কেউ অসম্মান ও লাঞ্ছনার জীবন-যাপনে মেয়েকে বাধ্য করত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمۡ بِالۡاُنۡثٰى ظَلَّ وَجۡهُهٗ مُسۡوَدًّا وَّهُوَ كَظِيۡمٌ‌ۚ ٥٨يَتَوَارٰى مِنَ الۡقَوۡمِ مِنۡ سُوۡٓءِ مَا
بُشِّرَ بِهٖ‌ ؕ اَيُمۡسِكُهٗ عَلٰى هُوۡنٍ اَمۡ يَدُسُّهٗ فِى التُّـرَابِ‌ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُوۡنَ ٥٩

“আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হত, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়, আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে সে দুঃখে সে কওম থেকে আত্মগোপন করে। অপমান সত্ত্বেও কি একে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রাখ, তারা যা ফয়সালা করে তা কতই না মন্দ”! (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫৮-৫৯)

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَاِذَا الۡمَوۡءٗدَةُ سُئِلَتۡ‌ۙ ٨ بِاَىِّ ذَنۡۢبٍ قُتِلَت ۚ ۡ

“আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে”? [সূরা আত-তাকওয়ীর, আয়াত: ৮-৯]

‘মাওউদাতু’ সে মেয়েকে বলা হয়, যাকে জীবিত দাফন করা হয় যেন মাটির নীচে মারা যায়। কোনো কন্যা যদিও জ্যান্ত দাফন থেকে নিষ্কৃতি পেত, কিন্তু লাঞ্ছনার জীবন থেকে মুক্তি পেত না।দারিদ্র্যের কারণে বড় হলে ব্যভিচারিনী বা শত্রু গোত্রের দ্বারা লুণ্ঠিত বা অপহৃত হওয়ার ভয়ে তারা নবজাতক কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত।

# জাহিলিয়াত যুগে বিবাহ প্রথা:

ইসলাম পূর্ব যুগে বিবাহ প্রথায় সুনির্দিষ্ট কোন রীতি ছিল না। পুরুষরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ, ইচ্ছামতো বর্জন, অবৈধ প্রণয় এবং বহু রক্ষিতা রাখত। তেমনি নারীরাও একাধিক স্বামী বা বহুপতি গ্রহণ ও ব্যভিচারে লিপ্ত হতো। শুধু তাই নয় ভাইবোন বিয়ে ও বিমাতাকে বিয়ে করার কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। পতিতাবৃত্তিও চালু ছিল।উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত তথ্যাদি সূত্রে জানা যায় যে, অন্ধকারে যুগে আরব সমাজে বিবাহের চারটি প্রথা প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি হচ্ছে তো সেই প্রথা যা বর্তমান যুগেও জনসমাজে প্রচলিত রয়েছে। এ প্রথানুসারে বিভিন্ন দিক বিবেচনার পর একজন তাঁর অধীনস্থ মহিলার জন্য অন্য এক জনের নিকট বিয়ের প্রস্তাব বা পয়গাম পাঠাতেন। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভের পর বর কনেকে ধার্য মোহর দিয়ে বিয়ে করত।নারী-পুরুষের মিলনের দ্বিতীয় প্রথাকে বলা হতো 'নিকাহে ইসতিবযা'। নারী-পুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য থাকত জ্ঞানী, গুণী ও শক্তিধর কোন সুপুরুষের সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সন্তান লাভ। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যখন কোন মহিলা ঋতু জনিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হতেন তখন তাঁর স্বামী তাঁকে তাঁর পছন্দ মতো কোন সুপুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠাতে বলতেন। এ অবস্থায় স্বামী তাঁর নিকট থেকে পৃথক হয়ে থাকতেন, কোন ক্রমেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতেন না। এদিকে স্ত্রী প্রেরিত প্রস্তাব স্বীকৃতি লাভ করলে গর্ভ ধারণের সুস্পষ্ট আলামত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতে থাকতেন। তারপর গর্ভ ধারণের আলামত সুস্পষ্ট হলে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতেন। হিন্দুস্থানী পরিভাষায় এ বিবাহকে 'নিয়োগ' বলা হয়।তথাকথিত 'বিবাহ' নামক নারী-পুরুষের মিলনের তৃতীয় প্রথা ভিন্নতর রূপের একটি জঘণ্য ব্যাপার। এতে দশ থেকে কম সংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি দল একত্রিত হতো এবং সকলে পর্যায়ক্রমে একই মহিলার সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতো। এর ফলে এ মহিলা গর্ভ ধারণের পর যথা সময়ে সন্তান প্রসব করত। সন্তান প্রসবের কয়েক দিন পর সেই মহিলা তাঁর সঙ্গে যাঁরা সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের সকলকে ডেকে নিয়ে একত্রিত করতেন। প্রচলিত প্রথায় বাধ্য হয়েই সংশি-ষ্ট সকলকে সেখানে উপস্থিত হতে হতো। সেখানে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে অমত করার কোন উপায় থাকতনা। মহিলার আহবানে যখন সকলে উপস্থিত হতেন তখন সকলকে লক্ষ্য করে মহিলা বলতেন যে, 'আপনাদের সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ার ফলেই যে আমার এ সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে এ ব্যাপারটি আপনারা সকলেই অবগত আছেন।'তারপর সমবেত লোকজনদের মধ্য থেকে এক জনকে লক্ষ্য করে বলতেন 'হে অমুক, আমার গর্ভজাত এ সন্তান হচ্ছে

আপনারই সন্তান।’ মহিলার ঘোষণাক্রমে সন্তানটি হতো তাঁরই সন্তান এবং সংশি-ষ্ট সকলেই এর স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য থাকতেন।

নারী-পুরুষের ‘বিবাহ ও মিলন’ নাম দিয়ে আরও একটি জঘন্য রকমের অশ্লীল রেওয়াজ জাহেলিয়াত যুগের আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। এতে কোনো মহিলাকে কেন্দ্র করে বহু লোক একত্রিত হতেন এবং পর্যায়ক্রমে তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেন। এরা হচ্ছেন পতিতা প্রবৃত্তির পেশাবলম্বিনী মহিলা। কাজেই, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোন লোক তাঁদের নিকট আগমন করলে তাঁরা আপত্তি করতেন না। এদের বাড়ির প্রবেশ দ্বারে পেশার প্রতীক হিসেবে নিশান দিয়ে রাখা হতো যাতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নির্দ্বিধায় গমনাগমন করতে পারেন। যৌনক্রিয়ার ফলে গর্ভ ধারণের পর যখন কোন মহিলা সন্তান প্রসব করতেন তখন তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী সকল পুরুষকে একত্রিত করা হতো। তারপর যে ব্যক্তি মানুষের অবয়ব প্রত্যক্ষ করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে সেখানে আহবান জানানো হতো। সেই ব্যক্তি উপস্থিত সকলের অবয়ব নিরীক্ষণান্তে তাঁর বিবেচনা মতো এক জনের সঙ্গে সন্তানপির যোগসূত্র বা সম্পর্ক স্থাপন করে দিতেন। তিনি বলতেন, ‘এ সন্তান আপনার’’। যাঁকে লক্ষ্য করে এ রায় দেয়া হতো তিনি তা মানতে বাধ্য থাকতেন। এভাবে নবজাতকটির একজন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যেত। তিনিও শিশুটিকে তাঁর ঔরসজাত সন্তান বলেই মনে করতেন।

যখন আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে রাসূল রূপে প্রেরণ করলেন তখন জাহেলিয়াত যুগের সর্ব প্রকার অশ্লীল বৈবাহিক ব্যবস্থার অবসান ঘটল। বর্তমানে ইসলামী সমাজে যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত রয়েছে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে রাসূলে কারীম (ﷺ) আরব সমাজে সেই ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত করেন।

আরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরবের নারী-পুরুষদের অন্য রকম সম্পর্কের কথা জানা যায়। তৎকালে, অর্থাৎ জাহেলিয়াত আমলে নারী-পুরুষ সম্পর্ক বন্ধনের ব্যাপারটি এমন প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যা তলোয়ারের ধার এবং বল্ল-মের ফলার সাহায্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতো। এতে গোত্রীয় যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষেত্রে বিজয়ী গোত্র বিজিত গোত্রের নারীদের আটক রেখে যৌন সম্ভোগে তাদের ব্যবহার করত। এ সকল মহিলার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মলাভ করত তাদের কোন সামাজিক মর্যাদা দেয়া হতো না। সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে সারা জীবন তাদেরকে খাটো হয়েই থাকতে হতো।

জাহেলিয়াত আমলে একই সঙ্গে একাধিক অনির্দিষ্ট সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। একই সঙ্গে দু'সহোদরাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে সংসার করাটা কোন দোষের ব্যাপার ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর এবং পিতা কর্তৃক তালাক প্রাপ্তা বিমাতাকে বিবাহ প্রথাও তৎকালে চালু ছিল।সমাজে দাসীগণকে অত্যন্ত দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করতে হতো। তৎকালীন সমাজে এমন মনিবের সংখ্যা খুব কমই ছিল যিনি দাসীদের নিয়ে নানা অনাচার, যথেচ্ছাচার ও পাপাচারে লিপ্ত না হতেন। এ সব অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন লজ্জাবোধ কিংবা সংশয়ের সৃষ্টি হতো না।

অতএব, আইয়ামে জাহিলিয়া যুগে নারীদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত অবমাননাকর ও দুর্দশাগ্রস্ত, যা ইসলাম আগমনের পর ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল।

## ইসলাম ও নারী

কুরআনে কারীমের সূরা নিসার প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষ সংক্রান্ত একটি ধারণা দিয়েছেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। তাতে বলা হয়েছে-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً.

হে মানব জাতি! তোমরা ভয় কর তোমাদের সে প্রতিপালককে যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক জীবন্ত সত্তা থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি। আর এই উভয় থেকেই ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য নারী ও পুরুষ।(সূরা নিসা: ১)

এতে প্রমাণিত হয় নারী-পুরুষ উভয়ই একই জীবন্ত সত্তা থেকে সৃষ্টি। উভয়ই মানুষ। এদের কেউই নিছক জন্তু জানোয়ার নয়। নারী কোন স্বতন্ত্র জাতিসত্তা নয়, যেমন নয় পুরুষ। মৌলিকভাবে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নর-নারী উভয়ই। প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া আ.। হযরত আদম ও হাওয়া আ. সৃষ্টির মৌলিক উপদান এক ও অভিন্ন।নারী-পুরুষ মানবতার সৃষ্টি শাখা বা অংশ।
সূরা হুজরাতের ১৩ নং আয়াতে আরো সুন্দরভাবে আল্লাহ পাক নর-নারী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُم.

হে মানব সমাজ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থেকে। এবং বিভক্ত করেছি তোমাদের বিভিন্ন বংশ ও গোত্র শাখায়, যেন তোমরা পরস্পরের পরিচয় লাভ করতে পার। সুনিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশী তাওয়া পরহেযগারীর অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট সার্বিক সম্মানি।(সূরা হুজরাত: ১৩)
এতে বুঝা যায়, সর্ব কালের, সব জাতের, সবদেশের মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টি। যেহেতু একই সত্তা থেকে সব মানুষের সৃষ্টি, তাই বনি আদমের মাঝে সবাই সমান, তাতে ছোট-বড় নেই, নেই আশরাফ-আত্মাফ, ভদ্র-অভদ্র। সবাই একই মাতাপিতার আপন সন্তান। সব বণী আদমের অস্তিত্বে আদম-হাওয়ার অবদান সমান।
পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَالْقُنِتِينَ وَالْقُنِتْتِ وَ الصَّدِقِينَ وَالصَّدِقْتِ
وَالصَّبِرِينَ وَ الصبِرَاتِ وَالْخُشِعِينَ وَالْخُشِعْتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقْتِ وَالصَّابِبِينَ وَ الشَّمْتِ
وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظْتِ وَ الذُّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرْتِ أَعَدَّ اللهُ
لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

‘আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, নম্র পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও নারী, সম্ভ্রম হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী এবং আল্লাহকে অধিক সম্মানকারী পুরুষ ও নারীর জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও প্রতিদান রেখেছেন।’ (সুরা আহযাব: ৩৫)
এ আয়াত থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে নারী-পুরুষ উভয়েই আল্লাহর কাছে মর্যাদাপূর্ণ এবং কর্মসম্পাদনে পরস্পরের পরিপূরক।সমাজেনারীর ভূমিকা অনন্য। নারীই পরিবার ও সমাজের ভিত রচনা করে দেয় এবং পরবর্তী প্রজন্ম নারীর কাছ থেকেই মৌলিক শিক্ষা লাভ করে। পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা এবং মহানবী (সা.)-এর সমগ্র জীবনাচরণ অনুসরণের মাধ্যমেই নারীর জীবন হতে পারে সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ। ভারসাম্যপূর্ণ সুখী পার্থিব জীবন এবং সাফল্যমণ্ডিত পরকালীন জীবনের জন্য প্রকৃত ও আদর্শ জীবনব্যবস্থা গ্রহণে নারী হোক সদা আত্মপ্রত্যয়ী।আল্লাহ তা‘আলা যখনফিরেশতাদের সামনে ঘোষণা করলেন-

اِنِّیۡ جَاعِلٌ فِی الۡاَرۡضِ خَلِیۡفَۃً ؕ

পৃথিবীতে আমি খলীফাহ বানাতে চাই। (সূরা বাকারা : ৩০)

তখন প্রকৃতপক্ষে সেটা শুধু একজন পুরুষ (বা হযরত আদম আ.)কে সৃষ্টি করার ঘোষণা ছিলো না, বরং নর ও নারী সম্মিলিতরূপে যে 'মানব' সেই মানব সৃষ্টির ঘোষণা ছিলো। অর্থাৎ সেটা হযরত আদম ও হযরত হাওয়া উভয়ের সৃষ্টির ঘোষণা ছিলো। কারণ পৃথিবীতে মানবজাতির বিস্তার ও খেলাফত শুধু পুরুষ দ্বারা সম্ভব ছিলো না। আদমের খেলাফতে হযরত হাওয়ার ভূমিকা ছিলো অনিবার্য ও অপরিহার্য। জান্নাতে আমাদের বাবা হযরত আদম (আ.)কে যখন সৃষ্টি করা হলো, তখন নিজের মধ্যে তিনি একটি শূন্যতা, একটি অভাব এবং অশান্তি অনুভব করছিলেন। তিনি যখন ঘুমালেন তখন তাঁর বামপার্শ্বের অস্থির ঊর্ধ্ব-অংশ থেকে প্রথম নারী হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করা হলো। আদম যেন তাঁর সঙ্গ দ্বারা সুখ-শান্তি এবং স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করেন। বস্তুত পৃথিবীর প্রথম নারী ছিলেন প্রথম পুরুষের জন্য স্রষ্টার পক্ষ হতে জান্নাতের চেয়েও মূল্যবান উপহার। কারণ জান্নাত তার অফুরন্ত নায-নেয়ামত সত্ত্বেও আদমের অন্তরের শূন্যতা, নিঃসঙ্গতা, অভাব ও অশান্তি দূর করতে পারেনি। একা একা জান্নাত ভোগ করে আদমের অন্তরে শান্তি আসেনি। হযরত হাওয়াকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাওয়ার পরই আদমের কাছে জান্নাত জান্নাত মনে হয়েছিলো। জান্নাতের বাগানে দু'জনের এই যে শান্তির সম্পর্ক, এটা শুধু ঐ দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উভয়ের সন্তানসন্ততির ক্ষেত্রেও সমান সত্য। তাই আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

هو الذي خلقكم من نفس واحدة و جعل منها-
زوجها ليسكن إليها

তিনি ঐ সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি 'নফস' থেকে এবং বানিয়েছেন তার থেকে তার জোড়া যেন সে তার কাছে স্বস্তি লাভ করে। (সূরা আরাফ : ১৮৯)

সুতরাং বোঝা গেলো, পৃথিবীর প্রতিটি স্ত্রী তার স্বামীর জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পবিত্র উপহার। এজন্যই আল্লাহর নামকে মাধ্যম করে এবং মোহর আদায় করে একটি জান্নাতি উপহাররূপেই নারীকে গ্রহণ করতে হয়। আর এজন্যই বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক মুহূর্তে আল্লাহর পেয়ারা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

و إنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله

আর তোমরা তাদের গ্রহণ করেছো আল্লাহর আমানতরূপে, আর তোমরা তাদের 'লজ্জাস্থান'কে হালাল করেছো আল্লাহর কালিমাকে মাধ্যম করে।' (সহীহ বুখারী ১/৩৯৭)

উপরের আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো-

(ক) ফিরেশতাদের সভায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে খেলাফতের যে ঘোষণা, প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো নর ও নারীর সম্মিলিত যে 'মানবরূপ' সেই মানবসৃষ্টির ঘোষণা। (তাতে হযরত আদম আ.-এর ভূমিকা অবশ্যই প্রধান, তবে হযরত হওয়া আ.-এর ভূমিকাও ছিলো অনিবার্য ও অপরিহার্য।)

(খ) নারী হচ্ছে নরের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পবিত্র উপহার। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ শান্তি ও স্বস্তি লাভ করা।

(গ) পুরুষের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা দান করা এবং নারীর জীবনে সুখ-শান্তি নিশ্চিত করা। কারণ কোন নারী যদি তার পরিবারে লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত হয়; তার জীবনে যদি অশান্তি থাকে তাহলে সে পুরুষের জন্য সুখ-শান্তি ও স্বস্তির মাধ্যম কিছুতেই হতে পারবে না।

হযরত আদম আ. যত দিন জান্নাতে ছিলেন, তারপর যতদিন দুনিয়াতে জীবনযাপন করেছেন মা হাওয়াকে তিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনীরূপে প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা পরিপূর্ণরূপে দান করেছেন এবং সর্বদিক থেকে তাঁর সুখ-শান্তি নিশ্চিত করেছেন। ফলে তিনি নিজেও মা হাওয়ার সঙ্গে থেকে সুখ-শান্তি লাভ করেছেন।

হযরত আদম (আ.)-এর ইন্তেকালের পর মানবজাতি যত দিন তাদের পিতার তরীকার উপর ছিলো এবং নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা দান করেছিলো তত দিন তারা সুখে শান্তিতেই জীবন যাপন করেছে। নারীর কাছে সে সুকূন ও স্বস্তি পেয়েছে।

আরব জাহিলিয়াতের সমাজে আছে নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার মর্মন্তুদ ইতিহাস। শুধু এইটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, কন্যাসন্তানের জন্মকে তখন মনে করা হতো চরম কলঙ্কের বিষয়। জাহেলী সমাজের এই চিত্রটি দেখুন আল কুরআনে-

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمۡ بِالۡاُنۡثٰى ظَلَّ وَجۡهُهٗ مُسۡوَدًّا وَّهُوَ كَظِيۡمٌۚ ٥٨يَتَوَارٰى مِنَ الۡقَوۡمِ مِنۡ سُوۡٓءِ مَا
بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمۡسِكُهٗ عَلٰى هُوۡنٍ اَمۡ يَدُسُّهٗ فِى التُّـرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُوۡنَ ٥٩

আর যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তান জন্মের সংবাদ দেয়া হতো তখন দুশ্চিন্তায় তার মুখ কালো হয়ে যেতো, আর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। ঐ জঘন্য খবরের কারণে মানুষের কাছ থেকে সে মুখ লুকিয়ে ফিরতো। (আর দিশেহারা হয়ে ভাবতো যে কী করবে সে?) লাঞ্ছনা সহ্য করে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে। কত মন্দ ছিলো তাদের এ মনোভাব! (সূরা নাহল : ৫৮-৫৯)

সেখানে নারীর জন্মগ্রহণই ছিলো অপরাধ, আর বেঁচে থাকা ছিলো আরো বড় অপরাধ। তাই অধিকাংশ সময় জন্মদাতা পিতা কন্যাসন্তানকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতো এবং নিজের হাতে জ্যান্ত দাফন করে ফেলতো। অসহায় মায়ের বাধা দেয়ার কোন অধিকার ছিলো না। তাই কন্যাসন্তান জন্ম দেয়ার আশঙ্কায় মা ভুলে যেতো তার প্রসববেদনা। অস্থির পেরেশান হয়ে শুধু ভাবতো পিতার নিষ্ঠুরতা থেকে কীভাবে সে বাঁচাবে তার সন্তানকে? কোথায় কীভাবে লুকাবে সে তার কলিজার টুকরোকে?  কুরআনে অত্যন্ত আবেদনপূর্ণ ভাষায় এই নিষ্ঠুর প্রথার নিন্দা করে বলা হয়েছে-

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ٨ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ٥

আর যখন জ্যান্ত দাফনকৃত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো (তখন কী জবাব দেবে তোমরা?) (সূরা আত-তাকভীর : ৮ ও ৯)

এই ছিলো ইসলামের পূর্বে আরব সমাজ,বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিতে  নারীদের অবস্থা ও মর্যাদাগত অবস্থান। এককথায় যদি বলি তাহলে বলতে হয়, মানুষ হিসাবে নারীর কোন মর্যাদাই ছিলো না। চরম লাঞ্ছনা ও যিল্লতি ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছুই ছিলো না।

জাহিলিয়াতের আঁধার ভেদ করে ইসলামের সূর্য উদিত হলো। যাত্রা করল এক নতুন সভ্যতা! শুরু হলো মহা ইনকিলাব! বলা যায় নারী জাতির জন্য একটি নতুন দিগন্ত, একটি নতুন নির্দেশনা, একটি নতুন পথ এবং এক বরকতময় বিপ্লব শুরু হলো ইসলামের হাতে ধরে। এ বিপ্লব ছিল ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত। শিক্ষা, চরিত্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি, থেকে শুরু করে কোনো কিছুই বাদ দেয়নি এ আলোক যাত্রা।

ইসলামের এ মানবিক উপহার তৎকালের সব ধর্মের ভ্রান্ত মতবাদকে অসার সাব্যস্ত করল- যারা মনে করত, ‘নারীর মতো এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণিজগতে আর নেই। নারী প্রজ্বলিত অগ্নিস্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এসবই তার দেহে সন্নিবিষ্ট’। নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে

যারা বলেছে, Men should not love their অর্থাৎ 'নারীদের ভালোবাসা পুরুষদের উচিত নয়'।

ইসলামের এ মহান মানবিক উপহার সেসব দেশ ও সমাজকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে, যেখানে বিধবা নারীরা স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিত অবলীলায়! মিথ্যা প্রমাণিত করেছে সেসব সভ্যতাকে, যেখানে মনে করা হতো 'মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মতো নিকৃষ্ট আর কিছু নেই'।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলাম যে ভূমিকা রেখেছে, ইসলামের আগে পৃথিবীর বুকে কোনো ধর্ম বা সভ্যতা এভাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি! ইসলাম ও মহানবি (সা.) বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এক কালজয়ী আদর্শ স্থাপন করেছেন! মানব মন ও মানব সমাজে নারী প্রগতির গোড়াপত্তন করে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছেন।

## বিভিন্ন ধর্মে নারীর মর্যাদা ও অবস্থান :

মানবশিশু স্বাধীন সত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ছেলে ও মেয়ে একই উৎস থেকে সৃষ্ট। সৃষ্টিগতভাবে মেয়ে বা ছেলে প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগত কারণে একে অন্যের ওপর কোনো প্রাধান্য রাখে না। লৈঙ্গিক ভিন্নতার কারণে নারী ও পুরুষ যখন একে অন্যের ওপর অনধিকার চর্চা, বৈষম্য ও প্রাধান্য বিস্তার করতে চায় তখনই অধিকার ক্ষুণ্ন হয়।

মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম বা সমাজে কন্যা শিশুর উপযুক্ত মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি। সর্বত্রই সে ছিল পুরুষের দাসী ও বিলাসিতার সামগ্রী। সব প্রাচীন ধর্ম ও আইনে নারীরা পুরোহিত, স্বামী ও অভিভাবকের অধীন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যহীন বলে বিবেচিত হয়েছে। বিশ্বের প্রচলিত ধর্মসমূহের বর্ণনার দিকে তাকালে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইহুদি ধর্মে

ইহুদি ধর্মের কিতাবে মুকাদ্দাস (বাইবেলে) নারী সম্পর্কে অভিমত হল এই- সে কে? যে নাপাক থেকে পাক বের করবে। নেই কেউ। (আইউব-অধ্যায় ১৪)

অন্যত্র রয়েছে, এমন মানুষ কে, যে পাক হতে পারে? যে নারী থেকে জন্ম নিয়েছে সে কি করে সত্যবাদী হতে পারে?

অর্থাৎ, ইয়াহুদী ধর্মের দৃষ্টিতে ১. নারী নাপাক। ২. নারী সত্তার মধ্যে সত্যবাদীতা নেই। এ কারণে তার থেকে যার জন্ম, সে সত্যবাদীতা শূণ্য। এটা কোমল শ্রেণী নারী জাতির প্রতি কত বড় অপবাদ। যার ফলে মর্যাদা আর পবিত্রতা লজ্জায় মাথা নুয়ে ফেলে। ৩. মানুষ যেহেতু নারী থেকে জন্ম, তাই সে পবিত্র হতে পারে না। কেননা, নারীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব নাপাক। অতএব এমন কে রয়েছে, যে নাপাক থেকে পাক বের করতে পারে?

ইহুদি ধর্ম কন্যা না নারী সম্বন্ধে যে ধারণা পেশ করে তার সারমর্ম হচ্ছে এই, ‘পুরুষ সৎকর্মশীল ও সৎস্বভাব বিশিষ্ট, আর নারী ভণ্ড ও বদস্বভাবের। পৃথিবীর প্রথম মানব আদি পিতা আদম আলাইহিস্ সালাম চির সুখের স্থান জান্নাতে স্বচ্ছন্দে বসবাস করছিলেন। তাঁর স্ত্রী হাওয়া তাঁকে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে প্ররোচিত করেন।’’

ইহুদি ধর্মমতে, নারীর ওপর সৃষ্টিকর্তার চিরন্তন অভিশাপ রয়েছে। নারীর কারণে সবার ধ্বংস অনিবার্য।এ ধর্মে সামাজিক প্রার্থনায় দশজন পুরুষের উপস্থিতি জরুরি ছিল। কিন্তু নয়জন পুরুষ এবং বহু নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হতো না। কারণ নারী মানুষরূপে গণ্য হতো না। নারী ছিল উপেক্ষার পাত্র।

# খ্রিষ্টধর্মে

পৃথিবীর অন্যতম ধর্ম হচ্ছে খ্রিষ্টধর্ম। তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। এ ধর্মে নারীরা ছিল চরম অবহেলিত ও নিগৃহীত। খ্রিষ্টানরা নারীকে পাপের প্রতীক বলে বিশ্বাস করতো। তারা মনে করতো, আদম আলাইহিস্ সালামের স্ত্রী হাওয়ার ভুলের কারণে সকল নারীর রক্তে পাপের সঞ্চালন ঘটেছে। খ্রিষ্টান পাদ্রিরা নারীকে নরকের দ্বার এবং মানবের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ মনে করতো। তারা নারীকে সর্বাপেক্ষা জঘন্যরূপে চিত্রিত ও নিকৃষ্ট বিশেষণে ভূষিত করতো।

খ্রিষ্টসমাজ নারীকে আত্মাহীন প্রাণী ও সন্তান উৎপাদনের একটি প্রাকৃতিক যন্ত্ররূপে আখ্যায়িত করেছে।তাদের ধারণা, ঈসা আলাইহিস্ সালামকে শুলবরণ করতে হয়েছে নারীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই। খ্রিষ্টান পাদ্রিদের মতে, "নারী যাবতীয় পাপের উৎস। নারী হচ্ছে শয়তানের প্রবেশস্থল এবং তারা আল্লাহ তাআলার মান সম্মানে বাধা দানকারী।" এ প্রসঙ্গে মোস্তাম নামক এক খ্রিষ্ট ধর্মযাজক বলেন, "নারী এক অনিবার্য আপদ। পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি। মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা।"

খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যে নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার বর্ণনাতীত। নারী জাতিকে অতীব হীন ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের প্রবল ভূমিকা রয়েছে। উভয় ধর্মই নারীকে পাপের আদি কারণরূপে আখ্যায়িত করেছে। বাইবেলে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, "পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনান্তে সন্তান প্রসব করিবে; এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে; সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে।"

সেন্ট টমাস ঘোষণা করছেন, "নারী ঘটনাক্রমে সৃষ্ট একটি জীব। এটা জেনেসিস প্রতীকী হয়েছে, সেখানে হাওয়াকে আদমের একটি হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

খ্রিষ্টান এক পাদ্রি বলেছেন, "নারী সব অন্যায়ের মূল, তার থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। নারী হচ্ছে পুরুষের মনে লালসা উদ্রেককারী। ঘরে ও সমাজে যত অশান্তির সৃষ্টি হয় সব তারই কারণে। আর এ কারণেই তারা নারীর শিক্ষা অধিকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।" "রুশো থেকে শুরু করে ড. গ্রেগরি পর্যন্ত যারাই নারীর শিক্ষা ও আচরণ সম্পর্কে কথা বলেছেন, তারা নারীকে দুর্বল এবং নিকৃষ্ট হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাদের মতে, নারীর স্বাধীনতা ভোগ করার ক্ষমতা নেই। পুরুষের মধু সাথী হিসেবেই তাকে ভালো মানায়। আনুগত্য তার প্রধান

গুণ। পুরুষের তুলনায় নারীর এই দুর্বলতা প্রাকৃতিক ব্যাপার।” রুশোর এসব ধারণাকে ননসেন্স বলেছেন মেরি।

## গ্রিক সভ্যতা

গ্রিকরা নারীদের সম্পর্কে বলত: “নারী জাতি সব অকল্যাণের মূল।” (হেমা, আসমা জাহান, গ্রিক সভ্যতার যুগে নারীকে দুর্বিষহ মানবেতর দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। গ্রিক সভ্যতায় নারী কি মর্যাদার অধিকারী ছিল তা সক্রেটিস এবং এন্ডারস্কির ভাষায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সক্রেটিস বলেন, ‘নারী বিশ্বজগতের বিশৃঙ্খল ও ভাঙনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়, যা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুইপাখি তা ভক্ষণ করলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।’

গ্রিক সভ্যতায় নারী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে যেয়ে এন্ডারসকি বলেন: “অগ্নিদগ্ধ রোগী ও সর্পদংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব। কিন্তু নারীর জাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।”
গ্রিক সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর মতামত বিবেচনাযোগ্য ছিল না। নারীকে তাদের মতের বিরুদ্ধে অভিভাবকরা বিয়ে করতে বাধ্য করত।

## রোমান সভ্যতা

বিশ্বের প্রাচীনতম রোমান সভ্যতায় নারীর আইনগত কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিল না। নারীরা সামাজিক, নৈতিক তথা শিক্ষা-দীক্ষায় ছিল অবহেলিত ও বঞ্চিত। রোমান সমাজে মেয়ে সন্তানকে আজীবন পিতার অনুগত হয়ে থাকতে হতো। পুরুষের গৃহ সজ্জিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল নারী। স্বামীর মৃত্যুর পর তার পুত্র বা দেবর-ভাসুরদের তার ওপর আইনানুগ অধিকার জন্মাত। পুরুষদের যৌনক্ষুধা নিবারণের হাতিয়ার হিসেবে নারী ব্যবহৃত হতো। এমনকি স্বামী কোনো অপরাধের দায়ে স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারতো।

## চীনা সভ্যতা

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন চৈনিক সভ্যতায় নারীর মর্যাদা ছিল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। চীনের ধর্মগ্রন্থে নারীকে "ডধঃবৎ ড়ভ ড়িব" (দুঃখের প্রবণ) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা সব সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়।একটি চীনা প্রবাদে আছে: "তোমরা স্ত্রীর কথা শোন, কিন্তু বিশ্বাস করো না। এ কথাতেই প্রতীয়মান হয় চীন সভ্যতায় কন্যার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়।
বেটানি বলেছেন : 'অতলান্ত মৎস্যের গতিবিধির ন্যায় অপ্রমেয় ও অবোধ্য নারী চরিত্র বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর। তার নিকট মিথ্যা সত্য সদৃশ এবং সত্য মিথ্যাসম।" (দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, পৃ. ৭৩২।)

হিন্দু সভ্যতা

পৃথিবীর প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দু ধর্ম সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন। এ ধর্ম বৈদিক ধর্ম, আর্যধর্ম, সনাতন ধর্ম ইত্যাদি নামেও পরিচিত। হিন্দু ধর্মে নারীর কোনো মর্যাদা দেয়া হয়নি। এ ধর্মের অন্যতম গ্রন্থ 'মহাভরত'-এ বলা হয়েছে, "নারী অশুভ, সকল অমঙ্গলের কারণ, কন্যা দুঃখের হেতু।" (মহাভারত, ১ : ১৫৯ : ১১।) বেদে উল্লেখ রয়েছে, "যজ্ঞকালে কুকুর, শুদ্র ও নারীর দিকে তাকাবে না।" (বেদ, ৩ : ২ : ৪ : ৬।) হিন্দু ধর্মে নারীকে কোনো উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রদান করা হয়নি।

ভারতীয় সভ্যতায় নারীর অবস্থা ছিল অতীব শোচনীয়। উচ্চশ্রেণী ও রাজবংশের নারীদেরকে অধিকতর সাবধানতার সাথে ভিন্ন পুরুষদের কাছে হতে দূরে রাখা হতো। কারণ, তাদের মতে, সব ধ্বংসের মৌল উৎস ছিল নারী। বৈদিক যুগে নারী ছিল যুদ্ধলব্ধ লুটের মালামালের মতো। যুদ্ধে বিজয়ের পর বিজয়ী পক্ষ জোরপূর্বক নারীদের অপহরণ করতো এবং লুণ্ঠিত সামগ্রীর মতো তাদেরকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করতো। তৎকালীন সময়ে স্বামী স্ত্রীকে সেবাদাসীরূপে ব্যবহার করতো। কন্যাসন্তান প্রসবকারিণী স্ত্রী সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতো। স্বামীর ব্যভিচার, পতিতাগমন, এমনকি মৃত্যুতেও বিবাহ ভঙ্গ করা যেত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল, রেষারেষি, শত্রুতা ও ঘৃণা বিরাজ করলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ নারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ভারতীয় সমাজে কন্যাসন্তান জন্ম নেয়া যেমন অপরাধ ছিল, তেমনি গোটা সমাজে নারী ছিল ব্যবহার সামগ্রী সদৃশ। মানুষ হিসেবে নারীর ছিল না কোনো মানবাধিকার।

# বৌদ্ধধর্ম

বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মসমূহের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম অন্যতম। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ নারী জাতির জন্য কিছুই করে যাননি এবং কিছু করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। তবে হিন্দুধর্মের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মে নারী ততটা অবহেলিত নয়। মহামঙ্গল সূত্রে গৌতম মাতার সেবা ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণকে উত্তম মঙ্গল বলে আখ্যায়িত করেন। (দৌলাতানা, মমতাজ, ধর্ম, যুক্তি ও বিজ্ঞান, ঢাকা: জ্ঞানকোষ, ১৯৯৭, পৃ. ১০৮।) জানা যায়, রাজমহিষী মল্লিকাদেবী কন্যাসন্তান প্রসব করলে রাজা বিমর্ষ হন। আর বুদ্ধ রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, ‘‘কন্যাসন্তানের জন্মহেতু কারো দুঃখ করা উচিত নয়। সুশীলা ও ধর্মপ্রাণ কন্যা হলে সে পুত্র অপেক্ষা শ্রেয় হয়।’’

উপযুক্ত বিবরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও হিন্দু ধর্মের কোন একটিতেও কন্যা বা নারীর কোন মর্যাদা ছিল না। নারী যে একটি প্রাণী, পুরুষের মতো তারও প্রাণ আছে তা উপরে বর্ণিত কোনো ধর্মই স্বীকার করতো না। নারীকে গৃহের অন্যান্য আসবাবপত্রের মতো মনে করা হতো।

# আরব সমাজ

ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে কন্যাসন্তানের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান খারাপ ছিল। কন্যারা ছিল ঘৃণিত, মর্যাদাবহির্ভূত এবং অধিকার ও মূল্যহীন। তারা মানবরূপে গণ্য ছিল না। কন্যাসন্তান জন্মানো চরম অভিশাপ বলে গণ্য করা হতো। কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর পর্যন্ত দেয়া হতো। ভোগ্যপণ্যের চেয়ে অবমূল্যায়িত ছিল নারী। এককথায় কন্যারা সে সমাজে ছিল শোষিত, অধিকারবঞ্চিত এবং শিক্ষা-দীক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের কোনো সুযোগই তারা পেত না।সে সমাজে নারীদের স্থান এত অধঃপতিত ছিল যে, তাদের সন্তানরা তাদেরকে দাসে পরিণত করত। নারীরা নিজ গৃহেই ছিল নির্বাসিত। স্ত্রীদের শিক্ষার অধিকার ছিল না। তাদের স্বামী কর্তৃক তারা একটা বাচাল বৈ কিছুই মনে করা হতো না।

অথচ কন্যাসন্তান প্রসবে নারীর কোনো হাত নেই। সে যুগে আবু হামযা নামে এক সম্ভ্রান্ত সর্দার কন্যাসন্তান জন্মের পর অপমানে আত্মগোপন করে বেড়ালে তার স্ত্রী মনের দুঃখে এ কাব্য আবৃত্তি করেছিল- ‘আবু হামযার কী হলো! সে আমাদের নিকট না এসে প্রতিবেশীর বাড়িতে রাত্রি কাটায়। আমি পুত্রসন্তান প্রসব না করার দরুণই সে আমার ওপর অসন্তুষ্ট

হয়েছে। আল্লাহর কসম! পুত্রসন্তান জন্মদান আমার ক্ষমতাধীন নয়। আমরা শস্যক্ষেত্র তুল্য। স্বামীগণ আমাদের মাঝে যে বীজ বপন করে, তাতে সে শস্যের চারাই জন্মে।

এভাবে দেখা যাচ্ছে, কুরআন নাজিলের আগে দুনিয়ার কোনো দেশে, কোনো সভ্যতায়ই নারীকে কোনোরকম মর্যাদা দেয়া হয়নি। কোথাও নারী সম্পত্তির মালিক ও উত্তরাধিকারী হতে পারতো না।

## ইসলামে নারীর অধিকার :

মানব সৃষ্টির প্রথম দিকে আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সহধর্মিনী হিসেবে তাঁরই বাম পাঁজরের একটি হাড় হতে আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-কে সৃজন করেন। অতঃপর তাঁদের হতে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

'হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি।' (সূরা-হুজুরাত ১৩)।

মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলূকাতের মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلا-ً

'আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' (বনী ইসরাঈল ৭০)।

আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা

এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (বাক্বারাহ ২২৮)

ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করত নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল-

## বিবাহের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার দান:

জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদেরকোনোরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করে নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلٰثَ وَ رُبعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى إِلَّا تَعُوْلُوْا

আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দু'টি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় কর যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা যুলম করবে না।

## স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার দান :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পছন্দমতো স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হতো। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হতে পারবে না। হাদীসে এরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি’।(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত -৩১২৬)

## মোহর আদায়ের মাধ্যমে নারীর অধিকার :

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً‘

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে’ (সূরা-নিসা ৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে শর্তটি পূরণ করা সবচেয়ে জরূরী তা হলো ঐ শর্ত- যা দ্বারা তোমরা (স্ত্রীর) লজ্জাস্থান হালাল করো’। অর্থাৎ ‘মোহর’।
(বুখারী ও মুসলিম, বুলূগুল মারাম, হা/৯৮৯)

## সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার :

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর শারীরিক কষ্টের বিষয়টি খেয়াল রেখে ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

‘হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের স্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অশুচি জনিত কষ্টদায়ক বিষয়। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালীন মহিলাদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাকো। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটে যেও না। যখন তারা (সম্পূর্ণরূপে) পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে হুকুম করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালোবাসেন।(সূরা- বাক্বারা ২২২)

পায়ুপথে সহবাস করা হারাম। তবে পুরুষরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গে যেদিক থেকে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শস্যক্ষেত্রে গমন কর’ (সূরা-বাক্বারাহ ২২৩)

হাদীসে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ-

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ইহুদীরা বলত, পুরুষ যদি পশ্চাৎদিক হতে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করে তাহলে সন্তান ট্যারা হয়। (তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে) কুরআন মাজীদের এ আয়াত نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ‘তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার’ (বাক্বারাহ ২২৩)’। (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৩; ইবনু মাজাহ হা/১৫৬২)

# ইসলামে নারীর শিক্ষাগত অধিকার:

ইসলামধর্মে জ্ঞানার্জনকে অতীব গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।কুরআন শরীফের সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। পড়া অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করার নির্দেশনা দিয়ে ইসলামের শুভ সূচনা। জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে কুরআন শরীফে আরো বলা হয়েছে,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

‘বল,যারা জানে (জ্ঞানী) আর যারা জানে না (জ্ঞানী নয়) তারা কি সমান?’ (সূরা আয-যুমার, আয়াত : ৯) মুসলমানদের জ্ঞানার্জন করার জন্য হাদিসে শুধু খুব উৎসাহই প্রদান করা নয়, অবশ্য কর্তব্য বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন,

‘জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।(ইবনে মাজাহ-২২৪)

অর্থাৎ পুরুষের যেমন শিক্ষার অধিকার আছে, তেমনি নারীরও শিক্ষার অধিকার আছে, যা উভয়ের জন্য অবশ্যই পালনীয়।জ্ঞানী লোকদের আল্লাহ তায়া'লা উচ্চ মর্যাদা দান করবেন বলেও ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন' (সূরা মুজাদালাহ-১১)।

# ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার:

ইসলামে পরিবার-পরিজন চালানোর জন্য, ভরণ-পোষণের জন্য নারীর অর্থ-উপার্জনের প্রয়োজন নেই, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নারীরা যদি অর্থ উপার্জন করে তাহলে তা তাদের নিজস্ব সম্পদ বলে পরিগণিত হয়। এ সম্পদসহ অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের কর্তৃত্ব শুধু তাদেরই থাকে।তারা তাদের ধন-সম্পদ ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ

'পুরুষরা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ, আর নারীরা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ।' (সুরা নিসা, আয়াত : ৩২)

কুরআন ও হাদিসে কোথাও নারীর কাজ করার বাধা-বিপত্তি আরোপ করা হয়নি। তবে শর্ত হলো, এ কাজ শরিয়তের সীমার মধ্যে হতে হবে। অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ ইসলাম দিয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'আল্লাহ প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন।' ( সহিহ বুখারি হা/৫২৩৭)

এ জন্য দেখা যায়, তৎকালে মুসলিম নারীরা অবস্থাভেদে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, শিল্প ও কারুকর্মে অংশগ্রহণ করতেন।

## উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর অধিকার :

ইসলাম নারীদের পিতা-মাতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের অধিকার প্রদান করেছে।উত্তরাধিকার হিসেবেও নারীকে উপরে রাখা হয়েছে। সাধারণত একজন পুরুষ স্বাভাবিকভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা-মাতার সম্পত্তি থেকেই অংশ পায়। কিন্তু একজন নারী সন্তান হিসেবে পিতা-মাতার কাছ থেকে, স্বামী মারা গেলে স্ত্রী হিসেবে স্বামীর কাছ থেকে, মা হিসেবে সন্তানের কাছ থেকে সম্পত্তির অংশ পায়। সবগুলো অংশ যোগ করলে এবং উল্লিখিত সবদিক বিবেচনা করলে নারীর অংশের সম্পত্তি, পিতা-মাতার কাছ থেকে পাওয়া পুরুষের অংশের সম্পত্তির চেয়ে বেশিই হয়ে যায়। ইসলাম এখানেও নারীকে উপরে রেখেছেন।।এ ব্যাপারে কুরআন শরীফে একাধিক আয়াতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কুরআন শরীফের সূরা বাক্বারা, সূরা নিসা, সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে যে নারীরা স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে, কন্যা হিসেবে, বোন হিসেবে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا.

মাতা-পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে; তা অল্পই হোক অথবা বেশীই হোক, (প্রত্যেকের জন্য) নির্ধারিত অংশ (রয়েছে)(সূরা নিসা -৭)

আল্লাহ তাআলা আরো ঘোষণা করেন-

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ * لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

আল্লাহ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন; এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান,[১] কিন্তু দু-এর অধিক কন্যা থাকলে, তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ,[২] আর মাত্র একটি কন্যা থাকলে, তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে, তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ,[৩] সে নিঃসন্তান হলে এবং কেবল পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে, তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ,[৪] তার ভাই-বোন থাকলে, মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। [৫] এ (সবই) সে যা অসিয়ত (মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি উইল)

করে, তা কার্যকর ও তার (ছেড়ে যাওয়া) ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমরা তো জান না, তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী।[৬] এ আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত বিধান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।(সূরা নিসা -১১)

[১] এর যৌক্তিকতা এবং এটা যে সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কথা পূর্বে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ছেলে-মেয়ে উভয়ই হলে এই নীতি অনুযায়ী বণ্টন হবে। ছেলে ছোট হোক বা বড়, অনুরূপ মেয়ে ছোট হোক বা বড় সকলেই উত্তরাধিকারী হবে। এমন কি গর্ভস্থ সন্তানও উত্তরাধিকারী হবে। তবে কাফের সন্তানরা ওয়ারিস হবে না। [২] অর্থাৎ, কোন ছেলে যদি না থাকে, তাহলে মালের দুই তৃতীয়াংশ (মালকে তিনভাগ করে দু'ভাগ) দু'য়ের অধিক মেয়েদেরকে দেওয়া হবে। আর যদি মেয়ে কেবল দু'জনই হয়, তবুও তারা তিনভাগের দু'ভাগই পাবে। কারণ, হাদীসে এসেছে যে, সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ) উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। তাঁর ছিল দু'টি মেয়ে। সা'দ (রাঃ)-এর এক ভাই তাঁর সমস্ত মাল জবরদখল করে নেয়। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) মালের দুই তৃতীয়াংশ মেয়েদের চাচার কাছ থেকে নিয়ে তাদেরকে দিয়ে দেন। (তিরমিযী ২০৯২, আবূ দাউদ ২৮৯১, ইবনে মাজাহ ২৭২০নং) এ ছাড়া সূরা নিসার শেষে বলা হয়েছে যে, কোন মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী যদি কেবল তার দু'জন বোন হয়, তবে তারাও মালের দুই তৃতীয়াংশ পাবে। কাজেই দু'বোনে যদি মালের দুই তৃতীয়াংশের ওয়ারিস হয়, তাহলে দু'জন মেয়ের মালের দুই তৃতীয়াংশের মালিক হওয়ার অধিকার আরো বেশী। অনুরূপ দু'য়ের অধিক বোনের বিধান হল দু'য়ের অধিক মেয়ের মতনই। (অর্থাৎ, বোন দু'জন হোক বা দু'য়ের অধিক তারা মালের দুই তৃতীয়াংশই পাবে।) (ফাতহুল ক্বাদীর) সার কথা হল, দু'জন বা দু'য়ের অধিক মেয়ে হলে, মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি থেকে দুই তৃতীয়াংশই পাবে। অবশিষ্ট মাল 'আসাবাহ' (সবচেয়ে নিকটাত্মীয় উত্তরাধিকারী) জাতীয় ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন হবে। [৩] পিতা-মাতার অংশের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম অবস্থা হল, মৃত ব্যক্তির যদি সন্তানাদি থাকে, তাহলে তার (মৃত ব্যক্তির) পিতা ও মাতা উভয়েই মালের এক ষষ্ঠাংশ (ছয় ভাগের এক ভাগ) করে পাবে। অবশিষ্ট মাল সন্তানদের মধ্যে বণ্টন হবে। তবে মৃত ব্যক্তির সন্তান বলতে যদি কেবল একটি মেয়ে হয়, তাহলে মালের অর্ধেক (অর্থাৎ, ছয় ভাগের তিন ভাগ) মেয়ে পাবে, এক ষষ্ঠাংশ মা পাবে এবং আর এক ষষ্ঠাংশ বাপ পাবে। অতঃপর আরো যে এক ষষ্ঠাংশ অবশিষ্ট থাকবে, সেটাও 'আসাবাহ' হিসেবে পিতার ভাগে যাবে। অর্থাৎ, পিতা পাচ্ছে দুই ষষ্ঠাংশ। এক ষষ্ঠাংশ পিতা হিসেবে এবং আর এক ষষ্ঠাংশ 'আসাবাহ' হিসেবে। [৪] এটা হল, দ্বিতীয় অবস্থা। মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি নেই (জ্ঞাতব্য যে, পোতা-পুতীরাও সকলের ঐকমত্যে সন্তানাদির

মধ্যেই শামিল) এই অবস্থায় মা পাবে এক তৃতীয়াংশ। অবশিষ্ট দু'ভাগ 'আসাবাহ' হিসেবে বাপ পাবে। আর যদি পিতা-মাতার সাথে মৃত পুরুষের স্ত্রী বা মৃত মহিলার স্বামীও জীবিত থাকে, তবে প্রাধান্য প্রাপ্ত উক্তি অনুযায়ী স্ত্রী বা স্বামীর অংশ (পরে এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে) বের করে নেওয়ার পর অবশিষ্ট মাল থেকে মায়ের হবে এক তৃতীয়াংশ এবং বাকী যা থাকে তা হবে বাপের। [৫] তৃতীয় অবস্থা হল, পিতা-মাতার সাথে মৃত ব্যক্তির ভাই-বোনও জীবিত আছে। তাতে তারা সহোদর অর্থাৎ, এক মাতৃগর্ভজাত হোক অথবা বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই-বোন হোক। যদিও এই ভাই-বোন মৃত ব্যক্তির পিতার উপস্থিতিতে উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার রাখে না, তবুও তারা মায়ের জন্য 'হাজবু নুকসান' (তার অংশ হ্রাস করণের) কারণ হবে। অর্থাৎ, তারা একাধিক হলে মায়ের এক তৃতীয়াংশকে এক ষষ্ঠাংশে পরিবর্তন করে দেবে। অবশিষ্ট সমস্ত মাল (ছ'ভাগের পাঁচভাগ) পিতার অংশে চলে যাবে। তবে শর্ত হল আর কোন ওয়ারিস যেন না থাকে। হাফেয ইবনে কাসীর লিখেছেন যে, দুইজন ভায়ের বিধানও দু'য়ের অধিক ভায়ের বিধানের মতনই। অর্থাৎ, ভাই বা বোন যদি কেবল একজন হয়, তাহলে মায়ের এক তৃতীয়াংশ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাতে কোন পরিবর্তন সূচিত হবে না। [৬] অতএব তোমরা তোমাদের জ্ঞানানুযায়ী মীরাস বণ্টন করো না, বরং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তা বণ্টন কর এবং যার যতটা অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাকে তা প্রদান কর।(আহসানুল বায়ান)

অতপর বিজ্ঞ আলেম উক্ত আয়াতগুলির ব্যাখ্যায় বলেন, ‘এ আয়াত দুটিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের প্রাপ্য সম্পদের অংশগুলিকে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন। এ থেকে কাউকে বঞ্চিত করা নিতান্ত জঘন্য পাপ ও মানবাধিকার পরিপন্থী।

এ ছাড়া ইসলামে নারীদের বিয়েতে মোহরানার (দেনমোহর) ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা সম্পদ লাভ করে। এ সম্পদের ওপর একচ্ছত্রভাবে অধিকার শুধু নারীরই আছে।

# ইসলামে নারীর আইনগত অধিকার:

ইসলামী বিধানে নারী এবং পুরুষ পরস্পর সমপর্যায়ের। ইসলামী শরিয়ত পুরুষ এবং নারীর জানমাল সুরক্ষায় সমান গুরুত্বারোপ করেছে। যদি কোনো পুরুষ কোনো নারীকে হত্যা করে তাহলে কেসাসস্বরূপ তার মৃত্যুদণ্ড হবে। যেমন, পুরুষকে হত্যা করলে মৃত্যুদণ্ড পেতে হয়, অনুরূপভাবে নারীকে হত্যা করলেও মৃত্যুদণ্ড হবে। আবার কোনো নারী যদি অন্য কোনো পুরুষ বা নারীর হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকে তাহলে তারও একই শাস্তি হবে।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِ وَالْعَبْدُ

بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَأْ ولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون.

অর্থ: "হে বিশ্বাসীরা। তোমাদের প্রতি নিহতদের কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলে, ক্রীতদাস ক্রীতদাসের বদলে এবং নারী নারীর বদলে। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে যদি কাউকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়, তবে যথাযথ বিধির অনুসরণ করবে এবং সততার সাথে তার দেয়া আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ, এরপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। হে বুদ্ধিমানরা কেসাসের মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো।" (সূরা আল-বাক্বারা: আয়াত-১৭৮-১৭৯)

ইসলামী আইনে শারীরিক ক্ষতি করার শাস্তি বিনা পার্থক্যে উভয়ের একই প্রকার। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই। যদি ইসলামী শরিয়তের কেসাসের পর্যালোচনা করা হয় তাহলে এটাই সামনে আসবে, যদি কোনো নিহতের উত্তরাধিকারী নারী হয় তাহলে তার ওই অধিকারই থাকবে যে অধিকার পুরুষ উত্তরাধিকারীর আছে। যদি সে ইচ্ছা করে কেসাস নিতে পারে আবার দিয়াতও (রক্তপণ) নিতে পারে। এতে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। যদি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, কিছু উত্তরাধিকারী দিয়াত গ্রহণের দিকে আর কিছু উত্তরাধিকারী হত্যার বদলে হত্যার দিকে হয়, তাহলে হত্যা বাতিল করে দিয়াত প্রদান করা হবে, কিন্তু এখানেও নারী-পুরুষের অভিমত একই পর্যায়ের এবং একই গুরুত্ব সহকারে

দেখা হবে। নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য করা হবে না। অন্যান্য অপরাধের ব্যাপারেও নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন, উভয়ের চুরির শাস্তি একই রকম। পাক কালামে ঘোষিত হয়েছে-

والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ: "পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে, তাদের হাত কেটে দাও, এটা তাদের কৃতকর্মের বিনিময় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ পরাক্রমশালী; প্রজ্ঞাময়।"(সূরা মায়েদা: আয়াত-৩৮)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, হাত কাটার ব্যাপারে নারী-পুরুষের জন্য একই আইন। যে-ই চুরিতে লিপ্ত হবে সে-ই পুরুষ হোক নারী হোক শাস্তি পাবে। লিঙ্গভেদে কোনো পার্থক্য হবে না, কোনো কমবেশিও কারো হবে না।

ব্যভিচারের ব্যাপারেও শাস্তির কোনো পার্থক্য নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا

طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِين.

অর্থ: "ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী তাদের প্রত্যেককে একশ' বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনের দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাক। মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"(সূরা নূর: আয়াত-২)

এখানেও লিঙ্গভেদে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। অবিবাহিত ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর শরিয়তের বিধানানুযায়ী একই শাস্তি নির্ধারিত। একশ' বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত বা অবিবাহিত পুরুষ নারী হলে 'রজম' অর্থাৎ, পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হবে।

এবার আমরা সাক্ষ্য আইনে আলোচনায় আসব। ইসলাম নারীকেও সাক্ষ্য দেয়ার অধিকার দিয়েছে। এ অধিকার আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগেই দেয়া হয়েছে। ইহুদি আইনজীবীরা বিংশ শতাব্দীতে চিন্তাভাবনা করেছিল নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কি-না আর সেখানে ইসলাম প্রায় দেড় হাজার বছর আগে নারীর সাক্ষ্য অনুমোদন করেছে।

আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন-

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا.

অর্থ: "যারা সতী-সাধ্বী নারীর ওপর অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চার জন সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।"(সূরা নূর আয়াত-৪)

একটি সাধারণ অপরাধে দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন, কিন্তু বড়ো ধরনের অপরাধে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। ইসলাম কোনো নারীর অপরাধের ব্যাপারে চারজন সাক্ষীর সাক্ষা জরুরি করেছে। বস্তুত সম্মানের দৃষ্টিতে নারীর সতীত্ব একটি বিরাট সম্পদ, সেদিকে ইঙ্গিত করাটা বড় অপরাধ বলে গণ্য করেছে।

## সম্পদসঞ্চয়ের অধিকার:

ইসলাম নারীসমাজের উপর দ্বিতীয় যে ইহসান করেছে তা এই যে, তাকে তার নিজস্ব পরিমন্ডলে সম্পদ উপার্জনের এবং সঞ্চয়ের অধিকার দান করেছে। মীরাস ও মোহররূপে যে সম্পদ সে লাভ করবে, নিজের শ্রম দ্বারা যে সম্পদ সে উপার্জন করবে সেগুলোর উপর তার পূর্ণ অধিকার ইসলাম নিশ্চিত করেছে। নারী যতই সম্পদশালী হোক, তার ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের, নারীর নিজের নয়। হাঁ, সচ্ছল নারী যদি স্বামীকে হাদিয়া দেয়, সাদাকা দেয়, দিতে পারে এবং সে জন্য সে দ্বিগুণ আজর পাবে। যেমন হাদীস শরীফে এরকম মযমূন এসেছে-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী হযরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তার স্বামী ও কয়েকজন ইয়াতিমের জন্য খরচ করতেন। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে সদাকা করতে উৎসাহিত করলেন। তখন যায়নাব রা. স্বামীকে বললেন, তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমার জন্য ও আমার তত্ত্বাবধানে থাকা ইয়াতীম শিশুদের জন্য যে খরচ করে থাকি তা ঐ সদাকার মধ্যে গণ্য হবে কি না। তিনি বললেন, আমার লজ্জা করে, তুমিই গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।

হযরত যায়নাব দরবারে নববীর দুয়ারে হাজির হলেন। দেখা গেলো, আরো কতিপয় নারী একই উদ্দেশ্যে সেখানে একত্র হয়েছে। এর পর তারা সকলে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উত্থাপন করলেন,

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে পাঠালেন যে, তারা দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে, সাদাকা করার এবং আত্মীয়তা রক্ষা করার। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৪৬৬)

## ইয়াতীম মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণ:

জাহিলিয়্যাত যুগে ইয়াতিম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুন্ন করা হত। যদি কোন অভিভাবকের অধীনে কোন ইয়াতীম মেয়ে থাকতো, আর তারা যদি সুন্দরী হতো এবং তাদের কিছুসম্পদ-সম্পত্তি থাকতো, তাহল তাদের অভিভাবকরা নাম মাত্র মহর দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিত, অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার ফিকির করতো।এসব অসহায় মেয়েদের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তাও করতো না।

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ঠিক এ ধরনের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। জনৈক ব্যক্তির তত্বাবধানে একটি ইয়াতীম মেয়ে ছিল। সে ব্যক্তির একটি বাগান ছিল। যার মধ্যে উক্ত ইয়াতীম বালিকাটিরও অংশ ছিল। সে ব্যক্তি উক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে নিল এবং নিজের পক্ষ থেকে দেন মহর আদায় তো করলোইনা বরং বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে আত্মসাৎ করে নিল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই নাযিল হয়-

وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، سورة النساء3:

অর্থাৎ, যদি ইয়াতীম মেয়েদের ব্যাপারে বে-ইনসাফীর আশংকা কর, তা হলে মেয়ের তো অভাব নেই; বিয়ে যদি করতেই হয় তবে অন্য স্ত্রীলোকদের (ইয়াতীম ব্যতীত) মধ্য থেকে একাধিক বিয়ে করতে পার।(সূরা নিসাঃ ৩)

## ইসলামে নারীর মর্যাদা :

## মা হিসেবে মর্যাদা :

মা হিসেবে মুসলিম নারীকে ইসলাম যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছে পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে ও মতবাদে তার কোনো নজির নেই।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের তাকীদ দিয়েছেন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে। সূরা লোকমানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ

وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْبَصِيرُ

আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই।(সূরা লোকমান-১৪)

মা হিসেবে নারীকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেয় ইসলাম। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রাসুল, কে আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার বেশি হকদার?’ তিনি বললেন ‘তোমার মা’; সে বলল, ‘তারপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মা’; সে আবারও বলল, ‘তারপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মা’। সে পুনরায় বলল, ‘এরপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার বাবা।’ (সহিহ বুখারি:৫৯৭১,সহিহ মুসলিম :২৫৪৮)

এই হাদিসে মহানবী (সা.) দেখিয়েছেন যে, মা সন্তানের প্রতি যে কষ্ট সহ্য করে-গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনের যে বিশাল ত্যাগ-তার কারণে মায়ের অধিকার বাবার চেয়ে তিন গুণ বেশি। এটি মা-বাবার প্রতি দায়িত্বের ভারসাম্য বুঝতে সাহায্য করে, যেখানে উভয়েরই অধিকার আছে, তবে মায়ের প্রতি করণীয়টা প্রথমে এবং বেশি।

মহানবী (সা.) আরও ইরশাদ করেন, ‘মায়েদের পদতলে জান্নাত।’ (সুনানে আন-নাসাঈ :৩১০৪)

এ হাদিসে মহানবী (সা.) অত্যন্ত গভীরভাবে মায়ের গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছেন। এখানে "মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত" বলতে বোঝানো হয়েছে-মায়ের সন্তুষ্টি অর্জন, তাকে সম্মান

করা এবং তার সেবা করা একমাত্র পথ হতে পারে জান্নাতে প্রবেশের। যদি মা অসন্তুষ্ট হন, তাহলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন।

এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "সর্বোত্তম কাজ কোনটি?"তিনি বললেন: "নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করা।"তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "এরপর কোনটি?"তিনি বললেন: "মায়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার।"(সহিহ বুখারি: ৫২৭, সহিহ মুসলিম: ৮৫)

এখানে বোঝানো হয়েছে, ইবাদতের মধ্যে সর্বোচ্চ হলো সালাত (নামাজ)। আর পার্থিব জীবনের দায়িত্ব ও আমলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো-মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার, যত্ন ও শ্রদ্ধা। এটা স্পষ্ট করে দেয় যে, মাকে অবহেলা করে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না।

ওয়াইস কুরুনি (রহ.) মহানবী (সা.)-এর যুগের লোক ছিলেন। মায়ের সেবায় ব্যস্ত থাকায় তাঁকে নবীজি মদিনায় আসতে বারণ করেন। ফলে সাহাবি হওয়ার অনন্য মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে তিনি মহানবী (সা.)-এর আদেশ মোতাবেক মায়ের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

একদা মু'আবিয়াহ বিন জাহিমাহ আস-সুলামী রাসূল (সা.)এর খেদমতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি যুদ্ধে যেতে চাই। আর এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি। উত্তরে তিনি বলেন, তোমার মা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তার খিদমতে লেগে থাকো। কেননা, জান্নাত তার দু'পায়ের নিচে (নাসাঈ, হা/৩১০৪, সনদ হাসান)।

এই হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায়, একজন মুসলমানের জীবনে মায়ের স্থান কতটা উচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণ।

## কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা :

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় দুলালী হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। নবীজীর চার মেয়ের মধ্যে বয়সে তিনি ছিলেন সবার ছোট। আবার মেয়েদের সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন। ব্যতিক্রম কেবলই হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তাই আদরের মেয়েদের প্রতি মনে কী পরিমাণ ভালোবাসা ও মমতা পুষতেন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার নমুনা আমরা সবচেয়ে বেশি লক্ষ করি হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে তাঁর আচরণে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনা-

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ حَدِيثًا وَكَلاَمًا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَاطِمَةَ، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا، فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ ، فَرَحَّبَتْ بِهِ وَقَبَّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا.

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথাবার্তায় ফাতেমার চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকেই দেখিনি। সে যখন তাঁর কাছে আসত তখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন, তাকে স্বাগত জানাতেন, চুমো খেতেন এবং নিজের আসনে তাকে বসাতেন। আবার যখন তিনি ফাতেমার কাছে যেতেন তখন সেও তাঁর জন্যে উঠে দাঁড়াত, তাঁর হাত ধরত, তাঁকে স্বাগত জানাত, চুমো খেত এবং নিজের আসনে তাঁকে বসাত। -(আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস ৯৭১)

হযরত উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহা। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতনী। তিনি যখন শিশু, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাকে কাঁধে চড়িয়ে মসজিদে চলে এলেন। এরপর এভাবেই নামাযে দাঁড়ালেন। দাঁড়ানো থেকে যখন রুকুতে যাবেন তখন তাকে নামিয়ে নিলেন। এরপর দাঁড়িয়ে আবার তাকে কাঁধে চড়ালেন। এভাবেই তিনি পুরো নামায শেষ করলেন। -(সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৭১১)

শুধুই নিজের মেয়ে আর নাতনীদের নিয়ে নয়, এমন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে অন্য সাহাবীদের মেয়েদের ক্ষেত্রেও। একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু কাপড় এল। এর মধ্যে একটি ছোট কালো কাপড়ও ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবীদের লক্ষ করে বললেন, এই কাপড়টি আমরা কাকে পরাতে পারি-বল দেখি! সকলেই চুপ করে রইল। এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা উম্মে

খালেদকে আমার কাছে নিয়ে আস। তাকে তখন কোলে করে নিয়ে আসা হল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই কাপড়টি হাতে নিয়ে তাকে পরিয়ে দিলেন। এরপর বললেন, أَبْلِي وَأَخْلِقِي অর্থাৎ তুমি তা পরে পুরনো করে ফেলো! কাপড়টিতে কিছু বিশেষ চিহ্ন ছিল। সেগুলো দেখিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখো, কী চমৎকার! -(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮২৩, ৫৮৪৫)

হাদীসের কিতাবে, সীরাতের গ্রন্থাবলিতে এমন ঘটনা আরও অনেক বর্ণিত হয়েছে। মেয়েশিশুদের তিনি খুবই আদর করতেন। অবশ্য ছেলেরাও তাঁর এ অকৃত্রিম স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতো না। প্রিয় নাতিদ্বয় হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে নিয়ে তো কত ঘটনা ছড়িয়ে আছে! কতভাবে তাদের আদর করেছেন! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে ইবরাহীম রা. যখন দুগ্ধপোষ্য শিশু, ধাত্রীমায়ের কাছে থাকে, তখন ছেলেকে তিনি দেখতে যেতেন বলেও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ছেলের মৃত্যুতে তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রুও ঝরেছে। আসলে এসবই মানুষের স্বভাবজাত, অকৃত্রিম। নিজের ঔরসজাত ছেলেমেয়ের প্রতি, তাদের সন্তানাদি তথা নাতি-নাতনীর প্রতি মানুষমাত্রই অনুভব করে এক অকৃত্রিম টান, নিখাঁদ ভালোবাসা। এর কোনো তুলনা হয় না, এটা অমূল্য। মানবজীবনের এ স্বাভাবিক দিকটির ওপর পবিত্র কুরআনে এভাবে আলোকপাত করা হয়েছে-

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا.

মানুষের জন্যে সুশোভিত করা হয়েছে চিত্তাকর্ষক বস্তুর আকর্ষণ, যেমন নারী, সন্তানাদি, পুঞ্জীভূত রাশি রাশি স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু আর ক্ষেতখামার। এসব পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী। -(সূরা আলে ইমরান : ১৪)

সন্তানকে দেখে বাবা-মায়ের চোখ জুড়ায়। তার যে কোনো সফলতা কিছু সময়ের জন্যে হলেও বাবা-মায়ের কষ্টকে ভুলিয়ে দেয়। এর ব্যত্যয় যেন না ঘটে, পবিত্র কুরআনে তাই দুআ শিখিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দান করুন, যারা হবে আমাদের নয়নপ্রীতিকর; আর আমাদেরকে আপনি মুত্তাকিদের প্রধান করে দিন। -(সূরা ফুরকান : ৭৪)

নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে হলেও মানুষ সন্তানের জীবন রক্ষা করতে চায়। সন্তানের সুখময় ভবিষ্যতের চিন্তায় নিজের বর্তমানের সুখকেও ভুলে থাকতে চায়। সন্তানের প্রতি ভালবাসা এমনই। ছেলে-মেয়ে এখানে সমান। দুজনই সন্তান এবং বাবার হৃদয়ের ভালবাসা উভয়ে সমানভাবেই দখল করে নেয়। মেয়েশিশুদের মতো স্বাভাবিকভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেশিশুদেরও ভালবেসেছেন, আদর করেছেন, কোলে তুলে নিয়েছেন। তবে মানুষের স্বভাবজাত এ আকর্ষণের পাশাপাশি মেয়েশিশুদের লালনপালন, তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ, তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে বিকশিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যে ফযিলত বর্ণনা করেছেন, সেখানে মেয়েরা অনন্য। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের ভরণপোষণের জন্যে কোথাও বেহেশতের ওয়াদা করেছেন, কোথাও তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ কিংবা লালনপালনের জন্যে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। লক্ষ করুন-

مَنْ كُنّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيهِنّ، وَيَرْحَمُهُنّ، وَيَكْفُلُهُنّ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ الْبَتّةَ "، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: " وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ "، قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ، أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ وَاحِدَةً، لَقَالَ: " وَاحِدَة." ً

যার তিনজন কন্যা সন্তান হবে আর সে তাদের আবাসের ব্যবস্থা করবে, তাদের প্রতি মমতা প্রদর্শন করবে এবং তাদের ভার বহন করবে, তার জান্নাত নিশ্চিত। জিজ্ঞেস করা হল-ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি দুইজন হয়? বললেন, দুইজন হলেও। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবীগণের কারও কারও ধারণা-‘যদি কেউ বলত একজন হলে? তাহলে নবীজী বলতেন, একজন হলেও।’ -(মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৪২৪৭; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৩৪৬)

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لاَ يَكُونُ لأَحَدِكُمْ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنّ إِلاّ دَخَلَ الجَنّة.

তোমাদের কারও যদি তিনটি মেয়ে কিংবা তিনজন বোন থাকে আর সে তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে, তাহলে সে জান্নাতে যাবে। -(জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১২)

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنّ وَاتّقَى اللهَ فِيهِنّ فَلَهُ الجَنّةُ.

যার তিনটি মেয়ে কিংবা তিনজন বোন রয়েছে, অথবা দুইটি মেয়ে কিংবা দুইজন বোন রয়েছে আর তাদের সঙ্গে সে ভালো ব্যবহার করেছে এবং তাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করেছে তাহলে তার জন্যে রয়েছে জান্নাত! -(জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৬)

مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ البَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنّ كُنّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النّارِ.

মেয়েদের লালনপালনের দায়িত্ব যার কাঁধে অর্পিত হয় আর তাদের বিষয়ে সে ধৈর্যধারণ করে তাহলে তারা তার জন্যে জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল হয়ে থাকবে। -(জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৩)

এই হল মেয়েশিশুকে লালনপালন করে তার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে তাকে সঠিক দীক্ষা দিয়ে বড় করে তোলার পুরস্কার-বেহেশতের নিআমত লাভ আর দোজখের আগুন থেকে মুক্তি! একজন পরকাল-বিশ্বাসী মুমিনের জন্যে এর চেয়ে বড় কোনো পুরস্কারের আর দরকার হয় না। কিন্তু হাদীস শরীফে মেয়ের অভিভাবকের জন্যে ঘোষিত হয়েছে এর চেয়েও বড় এক পুরস্কার!

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الجَنّةَ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِأُصْبعَيْهِ.

যে দুটি মেয়েশিশুকে দেখাশোনা করল, লালনপালন করল, আমি এবং সে এভাবে জান্নাতে প্রবেশ করব। একথা বলে তিনি হাতের দুই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখিয়েছেন। -(জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৪)

পরকালে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভ করা-একজন নবীপ্রেমিক এর চেয়ে বেশি আর কী আশা করতে পারে! মেয়েরা তাই বাবা-মায়ের জান্নাত লাভের মাধ্যম, জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির মাধ্যম এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ

লাভের মাধ্যম। এরা পরকালীন মুক্তির পয়গাম। এ মর্যাদা ও ফযিলত এককভাবে মেয়েদেরই, ছেলেদের ভরণপোষণে এমন কোনো অঙ্গীকার নেই। হ্যাঁ, সন্তান যদি নেককার হয়, তাহলে তো তার দুআর ফল মৃত্যুর পর কবরে থেকেও ভোগ করা যাবে, সে ছেলে বা মেয়ে যা-ই হোক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কালে যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এ ফযিলতের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তা মোটেও এর অনুকূল ছিল না। বাবারা মেয়েশিশুকে নিজের জন্যে খুবই অপমানের বিষয় মনে করত। একটা সময় এসে তারা নিজহাতে নিজের মেয়েদের জীবন্ত দাফন করতে শুরু করল। পবিত্র কুরআনের একটি বর্ণনা-

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ، يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ، اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ، اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

তাদের কাউকে যখন মেয়েশিশুর সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার দুঃখে সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে-হীনতা সত্ত্বেও তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তা কত নিকৃষ্ট! -(সূরা নাহল : ৫৮-৫৯)

খোলা চোখে ছেলেসন্তানকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। এদের মাধ্যমে বংশধারা টিকে থাকবে, এরা বুড়ো বয়সে পাশে থাকবে, দুনিয়ার জীবনে এরা হবে একটা আশ্রয় ইত্যাদি চিন্তা মানুষ করে থাকে। কিন্তু ভবিষ্যতে আসলেই যে কী হবে-তা তো একমাত্র আলিমুল গায়েব আল্লাহ তাআলাই জানেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মা হযরত মারইয়াম রা.। মারইয়ামের জন্মের আগেই তার মা মান্নত করেছিলেন-সন্তান জন্মের পর তাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতে নিয়োজিত করবেন। তার ধারণা ছিল-তিনি ছেলেসন্তান জন্ম দেবেন। কিন্তু তিনি যখন এক মেয়েসন্তান প্রসব করলেন তখন কিছুটা হতাশার সুরে বলেছিলেন-হায়! আমি তো এক মেয়ে জন্ম দিলাম! মেয়েরা মসজিদের খেদমতের জন্যে উপযুক্ত নয়। আল্লাহ তাআলা তখন তাকে বলেছিলেন-

وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى.

ছেলে তো মেয়ের মতো নয়। [সূরা আলে ইমরান, ৩৬ নং আয়াত দ্রষ্টব্য]

অর্থাৎ যে ছেলে তুমি চেয়েছিলে, সে ছেলে মর্যাদায় তোমাকে যে মেয়ে দান করা হয়েছে তার সমস্তরে পৌঁছতে পারবে না। তাই আর ভাবনা কীসের! পরবর্তীতে কী হয়েছে তা তো আমাদের জানা-ই। এই মেয়েকে আল্লাহ তাঁর কুদরতের এক নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছেন। কোনো পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়াই তার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম!

মেয়েশিশুদেরকে নিয়ে সেকালের পাষণ্ডতার একটি উদ্ধৃতি দিই। এক সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিজের ঘটনা শুনিয়েছেন। তার ভাষ্য-আমার যখনই কোনো মেয়েশিশু জন্ম নিত আমি তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলতাম। একবার আমি সফরে ছিলাম। তখন আমার এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার মা তাকে বাড়িতে না রেখে তার মামাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আমি যখন সফর থেকে ফিরে আসি তখন সন্তানের খবর নিই। সে আমাকে বলল-আমাদের এক মৃত শিশু জন্ম নেয়। এভাবে অনেক দিন কেটে যায়। আমার মেয়েটি তার মামার বাড়িতেই বড় হতে থাকে। একদিন সে তার মাকে দেখতে আসে। তার সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হই। পরে আমি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি-সে আমারই মেয়ে। এরপর আমি তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। তার জন্যে মাটিতে একটি গর্ত খুঁড়ি। তাকে সেখানে ফেলে দিই। সে আমার কাছে জানতে চায়-বাবা, তুমি আমাকে কী করবে? আমি তার উপর মাটি ফেলতে থাকি আর সে বলতে থাকে-বাবা, তুমি কি আমাকে মাটিচাপা দিচ্ছ? আমাকে একাকী ছেড়ে দাও, আমি অন্য কোথাও চলে যাই। কিন্তু তার কোনো কথা না শুনে আমি তার উপর মাটি ফেলতেই থাকি, একপর্যায়ে তার সব আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যায়। এ বিবরণ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, এ তো নির্ঘাত এক পাষণ্ডতা! যে দয়া করে না, তাকেও দয়া করা হবে না! (আলওয়াফী বিল ওয়াফায়াত, কায়েস ইবনে আসেম এর জীবনী দ্রষ্টব্য)

তাছাড়া আল্লাহপাক পবিত্র কোরআন পাকে ছেলে (পুরুষ) নামে কোনো সূরা নাজিল করেননি বরং মেয়ে (নিসা-নারী) নামে সূরা নাজিল করেন। এতে সহজেই বোঝা যায়, পবিত্র কোরআন পাকেও মেয়েদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে। জাহিলিয়াত যুগে নারী এবং কন্যা সন্তানদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরমভাবে পঙ্গু করে রাখা হতো। মীরাসে তাদের কোনো অধিকার ছিল না বরং তারা নিজেরাই মীরাসের সম্পত্তি হিসেবে অন্যদের মাঝে বন্টিত হয়ে যেত। কিন্তু মানবতার ধর্ম ইসলাম চরম অবমাননাকর এ রীতি চিরতরে বন্ধ করে তাদেরকে মীরাসের অংশীদার নির্ধারণ করে দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনের সূরা নিসায় উল্লেখ

করেনÑ “আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের বিশেষ অর্থনৈতিক বিধান দিচ্ছেন তিনি আদেশ করছেন একজন পুরুষ দুজন মেয়েলোকের সমান অংশ পাবে। কেবলমাত্র মেয়ে সন্তান দুজন কিংবা ততধিক হলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি একজন মাত্র কন্যা সন্তান হয় তাহলে সে মোট সম্পত্তির অর্ধেক পাবে”। তাছাড়া ইসলাম কন্যার বিবাহ সম্পর্কে তার অভিভাবকদের ওপর তার মতামত গ্রহণ অপরিহার্য বলে নির্দেশ প্রদান করেন। এমনকি ইয়াতিম মেয়েদের বিবাহর ক্ষেত্রেও তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে আবু দাউদ শরিফে বিশ্ব নবী (সা.) ইরশাদ করেন,“ইয়াতিম মেয়েকে তার স্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যেতে পারে না।”

## স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা:

ইসলাম পূর্ব যুগে আরব সমাজে একজন স্ত্রীকে চরম অমর্যাদা ও অসম্মানের গ্লানি টানতে হতো। স্ত্রী সমাজে এবং স্বামীর নিকট যথাযোগ্য মর্যাদা পেত না। তার অধিকার দেয়া হত না। তাদের সাথে আচরণ ঠিক অনুরূপই করা হত যেমন করা হত দাসী-বাদীর সাথে। ইসলাম নারীদের এরূপ অবমাননাকর অবস্থা থেকে টেনে এনে যথাযোগ্য স্ত্রীর মর্যাদা দান করেছে। মৌলিক অধিকারে নারীকে পুরুষের সমান অংশীদার বানানো হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف.ِ

আর নারীদের অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর যেমনিভাবে পুরুষদের অধিকার রয়েছে স্ত্রীদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। (তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।) (-সূরা বাকারা: ১৮৮)

তদানীন্তন কালে আরবরা স্ত্রীদের উপর নানা প্রকার অকথ্য জুলুম নির্যাতন চালাত। কেউ কেউ তাদের রাখত ঝুলন্ত অবস্থায়। স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদাও দিত না, আবার তালাক দিয়ে অন্যত্র বিয়ে বসার সুযোগও করে দিত না। আটকে রাখত তাদের সম্পদ গ্রাস করার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এসব নির্যাতন থেকেও স্ত্রী জাতিকে মুক্তি দিয়েছেন। কুরআনে কারীমের সূরা নিসার ১৯ নং আয়াতে তাই ঘোষণা করা হয়েছে-

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ الح.ُ

হে স্বামীরা! তোমরা স্ত্রীদের বারণ করে রাখবে না এ উদ্দেশ্যে যে তাদের নিকট থেকে তোমাদের দেয়া সম্পদের কিছু অংশ কেড়ে নিবে।-(সূরা নিসা: ১৯)

এমনকি স্ত্রীদের তখন অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় মনে করা হত। স্বামী মারা গেলে পরিত্যাক্ত সম্পদের ন্যায় তাদেরও ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করে দিত। এ ব্যবস্থা শুধু জাহেলী যুগে নয় বরং প্রথম দিকে মুসলমানদের মাঝেও চালু ছিল। কুরআনে কারীমে এ বর্বর প্রথা সমূলে উৎখাত করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كُرْهًا.

হে ঈমানদাররা। তোমরা স্ত্রীদেরকে অন্যায়ভাবে জবরদস্তি করে নিজেদের উত্তরাধিকারের সম্পদে পরিণত কর না। এটা তোমাদের পক্ষে মোটেও হালাল হবে না। (সূরা নিসা: ১৯)

বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ গুরুত্ব সহকারে নারীদের ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে গিয়েছিলেন। তিনি ইরশাদ করেছেন,

فَاتَّقُو اللَّهُ فِي النِّسَاءِ فَأَنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ

فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَة الله

স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলবে। কারণ, তাদের গ্রহণ করেছ আল্লাহর নামে (নিরাপত্তায়) এবং এভাবেই বৈধ মনে করে তোমরা উপভোগ করছ তাদের লজ্জাস্থান সমূহ।(মুসলিম শরীফ, কিতাবুল হজ্ব: ১/৩৯৭)

## স্ত্রী অর্ধেক দ্বীন পরিপূর্ণ করার মাধ্যম:

ইসলামে স্ত্রীকে অর্ধেক দ্বীন পরিপূর্ণ করার মাধ্যম বানিয়েছেন। হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَل نصف الدين فليتق الله في

النصف الباقي

কোন বান্দা যখন বিয়ে করে তখন সে তার দ্বীনের অর্ধাংশ পূর্ণ করে নেয়। সুতরাং বাকী অংশের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা চাই। (মিশকাত শরীফ)

মিশকাত শরীফে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত একটি হাদীসে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেউ যদি আল্লাহ তা'আলার দরবারে পাক-পবিত্র অবস্থায় সাক্ষাত করতে চায়, সে যেন অবশ্যই ভদ্র তথা স্বাধীনা মহিলাদের বিয়ে করে। এতে প্রমাণিত হয়, বিয়ের মাধ্যমে একজন পুরুষ পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। অপর একটি হাদীসে স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহারকারী স্বামীকে ঈমানের পরিপূর্ণতার সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَنْ عَاءِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانَا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

সবচেয়ে কামিল ঈমানদার ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত সে যে তাদের মধ্যে স্ত্রীর সাথে অধিক নম্র ব্যবহারকারী এবং নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে সদ্ব্যবহারকারী। -(তিরমিযী শরীফ, মিশকাতঃ ২৮২)। হযরত আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانَا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيَارُكُمْ خَيَارُكُمْ

النساءكُم.ْ

সবচেয়ে পরিপক্ক ঈমানদার হচ্ছে সে যে তাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আর তোমাদরে মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম। -(তিরমিযী শরীফ: ২১৯)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর রিওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেন, একবার হাবশী এক প্রতিনিধি দল মসজিদের মধ্যে নেযাবাজি করছিল। আমি তখন তাদের সে খেলা দেখছিলাম। হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে চাদর জড়িয়ে খেলা দেখাচ্ছিলেন। তিনি  আমার খাতিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, আমি খেলা দেখে পরিতৃপ্ত হবার পর নিজেই সেখান থেকে চলে আসি। আন্দাজ করুন, একজন স্বল্পবয়স্কা রমনী খেলাধুলার প্রতি আসক্তা কত দীর্ঘ সময়ই না দাঁড়িয়ে থাকবে। - (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত শরীফ)

## স্ত্রীর মনোরঞ্জনের প্রতি রাসূলে আকরাম সা.

স্ত্রীর মনোরঞ্জনের প্রতি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতটুকু গুরুত্ব দিতেন তা অনুভব করা যায় এতেই যে, তিনি উম্মুল মু'মিনীনদের সঙ্গিনী ও আত্মীয়দের সাথেও সদ্ব্যবহার ও খাতিরদারী করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, হযরত খাদীজা রা. এর প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা ছিল অন্য কারো প্রতি এতটা ছিল না। অথচ আমি হযরত খাদীজা রা. কে দেখেনি, কিন্তু হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যবান মুবারকে তার আলোচনা বারবার শুনেছি। ঘরে যখন কোন বকরী যবেহ করা হত, তখন তার মধ্য হতে একটি অংশ কেটে আলাদা করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেখে দিতেন এবং এটা পাঠিয়ে দিতেন হযরত খাদীজা রা. এর সখীদের বাসায়। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, একবার আমি হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আরয করলাম, দুনিয়াতে যেন হযরত খাদীজা রা. ই একমাত্র মেয়ে ছিলেন। এতদশ্রবণে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, খাদীজা রা. এর মধ্যে এরূপ গুণ ছিল এরূপ গুণ ছিল, ইত্যাদি। তাছাড়া আমার সন্তানগুলো তারই গর্ভে জন্য নিয়েছে।(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, বাবু মানাকিবি আযওয়াজিন)
নবী সা. একবার হযরত খাদীজা রা. এর ইন্তিকালের পর তার বোন হালাহ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। ইসলামী রীতি মোতাবেক তিনি প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। যেহেতু হযরত খাদীজা রা. এর গলার স্বরের সাথে

হযরত হালার গলার আওয়াজ সামঞ্জস্য ছিল, সেহেতু তার আওয়াজ কানে প্রবেশ করার সাথে সাথেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নতুন করে হযরত খাদীজা রা. এর কথা স্মরণ হল। ফলে বে-ইখতিয়ার তিনি বলে উঠলেন, সম্ভবত হালাহ এসেছেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন, এতে আমার মনে ঈর্ষা জেগেছিল। -বুখারী শরীফ।

স্ত্রী হিসেবে ইসলাম নারী জাতিকে অধিকারও দিয়েছে। স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে ভালো আচরণ করার। আল কোরআনে বলা হয়েছে,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ ج بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيرًا

হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিছ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না, তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেয়ার জন্য, তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন।(সূরা নিসা -১৯)

এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে অপছন্দ না করে' (সহিহ মুসলিম : হাদিস : ১৪৬৯, সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস : ১৯৭৯)।

এই হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সা.) দাম্পত্য জীবনের কলহ নিরসন ও নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণের একটি মূলনীতি বলে দিয়েছেন। স্ত্রীর সব আচরণ স্বামীর কাছে ভালো লাগবে, এটা অসম্ভব। আবার স্বামীর সব আচরণ স্ত্রীর কাছে ভালো না লাগাই স্বাভাবিক।কারণ আল্লাহ তায়ালা কাউকেই পূর্ণতা দান করে সৃষ্টি করেননি। প্রত্যেকের ভেতরেই কিছু না কিছু মন্দ স্বভাব থাকবেই। ভালো ও মন্দ মিলেই মানুষ। কাজেই স্ত্রীর কোনো স্বভাব স্বামীর কাছে অপছন্দ হলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে।স্ত্রীর ভালো গুণগুলোর দিকে লক্ষ করে আল্লাহর শোকর আদায় করে এবং তার প্রশংসা করে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বামীর জন্য রাসুল (সা.)-এর জীবনই উত্তম আদর্শ। রাসুল (সা.) যখন ঘরে যেতেন, স্ত্রীদের সঙ্গে ঘরের কাজে তিনি শরিক হতেন। তাঁদের সঙ্গে সদাচার করতেন। স্ত্রীদের সঙ্গে খোশগল্প করতেন।তাঁদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন। রাসুল (সা.) কখনো কোনো স্ত্রীকে প্রহার করেননি। তিনি যখন তাহাজ্জুদের সময় উঠতেন, তখন খুব আস্তে দরজা খুলতেন, যাতে ঘরের লোকদের ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। তিনি ইরশাদ করেন,

তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো (তিরমিজি, হাদিস : **১১৬৩**)। অন্য হাদিসে আছে,

তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম' (জামে তিরমিজি, হাদিস : **১১৬২**)।

## বোন হিসেবে মর্যাদা :

মেয়েদের সম্পর্কে ইসলাম যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছে তার প্রভাব কেবল কন্যার ব্যাপারেই সীমিত থাকেনি, বোন, ভগ্নির ব্যাপারেও ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্যও উৎসাহিত করা হয়েছে।ইসলামে একজন নারীর "বোন" হিসেবে মর্যাদা অত্যন্ত সম্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এই মর্যাদার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করা হলো:

ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে ও তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে বারবার উৎসাহ দিয়েছে। বোন সেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজিব।কুরআনে আল্লাহ বলেন,

*"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরকে অনুরোধ করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকো।"*

(সূরা আন-নিসা, আয়াত **১**)

যদি বোন অবিবাহিত হয় বা স্বামীহীন হয়ে পড়ে, তবে ভাইয়ের ওপর তার দেখভাল ও ভরণপোষণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব পড়ে।রাসূল (সা.) বলেছেন: *"তিনজন বোন অথবা তিনজন কন্যার দেখভাল করে যে ব্যক্তি তাদেরকে উত্তমভাবে লালন-পালন করে, আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন।"*

( তিরমিযি,হাদিস-**১৯১২**)

জাহেলিয়াত যুগে নারীরা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল, ইসলাম এসে তা বাতিল করে বোনদের সম্পদের অধিকার দিয়েছে।আল্লাহ বলেন:

*"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের বিষয়ে আদেশ দিচ্ছেন... যদি ভাইবোন থাকে তবে প্রত্যেক পুরুষের জন্য দুই নারীর সমান অংশ।"*

(সূরা আন-নিসা, আয়াত **১১**)

রাসূল (সা.) বলেছেন:

*"তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি উত্তম।"*
(তিরমিযি)

বোন পরিবারের অংশ, তাই তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা একজন মুমিনের গুণ।একজন ভাইয়ের উচিত বোনের ইজ্জত, মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। ইসলাম নারীর পবিত্রতা ও সম্মান রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।-সূরা নিসাঃ ৩

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় ও মজবুত রাখার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম(রা.) এর অন্তরে ব্যাপকভাবে স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন। এতদস্বত্বেও বিশেষ করে বোনদের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ ও তাদের প্রতিপালনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয় বোন হিসেবে নারীকে ইসলাম কতটা উন্নত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ ঘোষণা দিয়েছেন- বোনদের প্রতিপালন জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম। আবূ দাউদ শরীফের এক রিওয়ায়াতে হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কন্যা সন্তান ও ছেলে সন্তানের মাঝে ব্যবধান না করার বিনিময় জান্নাত।এসব উৎসাহব্যঞ্জক হাদীসের উপরও আইনগতভাবে ইসলাম ভাইদের ব্যাপারে এ কানুন চালু করেছে যে, কোন মেয়ের যদি মাতা-পিতা না থাকে এবং বিদ্যমান থাকে ভাই, তাহলে বোনের প্রতিপালন, শিক্ষা-দীক্ষা খোরপোষ ইত্যাদি বিষয়ের দায়িত্ব পালন করতে হবে ভাইকেই। এসবের প্রভাব সাহাবায়ে কেরাম রা. এর জীবনে পড়েছে অত্যন্ত গভীরভাবে।

# দুধবোন শীমার সাথে নবীজীর আচরণ:

হুনাইনের যুদ্ধে যুদ্ধবন্দীদের সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক। সে সব যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন খোদ হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধবোন শীমাও। সাহাবায়ে কেরাম রা. তাকে গ্রেফতার করলে তিনি বললেন, আমি তোমাদের পয়গম্বরের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বোন। এতদশ্রবণে সাহাবীগণ কথার সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অত্যাধিক মহব্বত করতেন বলে তাকে দেখেই তার দুচোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তাঁর চাদর মুবারক বোনকে বসার জন্য বিছিয়ে দেন। অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে স্নেহ মমতা সহকারে তার সাথে কথোপকথন করেন। হাদিয়া দেন তাকে কয়েকটি উট এবং বকরী। অতপর তাকে বলেন, তোমার মনে চাইলে আমার সাথে থাকতে পার, আর যদি বাড়ী যেতে চাও তাও বল তোমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেয়া হবে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বোন বাড়ীতে যাওয়াই পছন্দ করলেন। ফলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সসম্মানে ইজ্জত ইহতিরামের সাথে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেন।-(তাবাকাতে ইবনে সা'দ) শুধু তাই নয়, বোনের প্রতি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই সদয় আচরণ দেখে একটি কুটনৈতিক প্রতিনিধি দল তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়। তারা এসে হযরতের দরবারে সমস্ত কয়েদীর মুক্তিদানের দরখাস্ত করে বসে। তারাও মুক্তির যোগ্য এর কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করে যে, ছাউনীতে যে সব বন্দী রয়েছে তাদের মধ্যে আপনার ফুফু এবং খালারাও রয়েছেন। (কারণ, হযরত হালীমা রা. ছিলেন তাদেরই বংশোদ্ভূত।) আল্লাহর শপথ, আরব রাজাদের কেউ যদি আমাদের খান্দানের দুধ পান করত, তাহলে আমরা তার কাছ থেকে অনেক কিছুর আশা করতাম। আর আপনার কাছ থেকে তো আরো অনেক বেশী কিছুর আশা পোষণ করি। এই জোরালো আবেদন এবং হৃদয় কাপানো আরয শুনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মন কেপে উঠল। তিনি বললেন, আবদুল মুত্তালিব বংশের যতটুকু অংশ রয়েছে সে টুকো সব তোমাদের। এরপরও ক্ষান্ত হননি বরং সাধারণ ক্ষমার তদবীরও তাদের শিখিয়ে দিলেন যে, নামাযের পর উপস্থিত সমাবেশে তোমরা এই আরয পেশ করবে। যোহরের নামাযের পর গোটা সমাবেশের সামনে যখন উপরোক্ত দরখাস্ত পেশ করা হল, তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার খান্দানের ব্যাপারটিই কেবল আমার ইচ্ছাধীন। তবে আমি সমস্ত মুসলমানের নিকট এই সুপারিশ (ক্ষমা ও পুরস্কারের) করছি। এটা শুনে সমস্ত মুহাজির-আনসার এক বাক্যে বলে উঠল, আমাদের অংশও (ক্ষমা করে দিলাম)। ফল শ্রুতিতে একই মুহুর্তে ছয় হাজার কয়েদী মুক্ত হয়ে গেল।

এবার চিন্তা করুন বোনের প্রতি এই সদ্ব্যবহারের প্রভাব সাহাবায়ে কেরাম রা. এর মধ্যে কিভাবে পড়তে পারে? এ কারণেই সাহাবীগণ নিজেদের উপকারের বিষয়টি দ্বিতীয় পর্যায়ে রেখে বোনদের লাভের কথা প্রথম পর্যায়ে রাখতেন। নিজেদের আরাম আয়েশের কথা ভুলে অন্যদের ফিকির করতেন।

## বোনদের প্রতিপালনে জাবির রা. এর ভূমিকা:

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর পিতা অনেকগুলো কমবয়স্কা কন্যা রেখে যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত জাবির রা. এর সম্মুখে দেখা দিল বোনদের প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধানের সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান কল্পে তিনি বিয়ে করলেন একজন বিবাহিতা মহিলাকে। হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, জাবির!তুমি কুমারী মেয়ে বিবাহ করনি কেন? প্রতিউত্তরে তিনি আরয করলেন, হযরত! আমার আব্বাজান অনেকগুলো কমবয়স্কা বোন রেখে শহীদ হয়ে গেছেন। আমি যদি স্বল্পবয়স্কা (কুমারী রমণী) বিয়ে করতাম, তাহলে সে তাদের শিক্ষা-দীক্ষাও দিতে পারতো না, সক্ষম হত না তাদের খোঁজ-খবর নিতে। এহেন সমস্যায় পড়েই আমি বিবাহিতা রমনী বিয়ে করেছি। যেন সে তাদের শাসন করতে পারে, চুল আঁছড়িয়ে দিতে পারে, বেছে দিতে পারে মাথার উকুন, কাপড় ছিড়ে গেলে সেলাই করে দিতে পারে। এক কথায় তাদের সব কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। (-মুসলিমঃ ১/৪৭৪)

এই ধরনের বহু ঘটনা পাওয়া যায় সাহাবায়ে কেরাম রা. এর বাস্তব জীবনে। ইসলাম শুধু বোনদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণেই উদ্বুদ্ধ করেনি বরং বোনদের জন্য মীরাসের নির্ধারিত অংশ রেখেছে। দিয়েছে বিভিন্নমুখী অধিকার। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ শাস্ত্রে রয়েছে।

## নারীর অধিকার সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি:

ইসলামী ইতিহাসের দেড় হাজার বছরের দীর্ঘ জীবনে কখনোই, তার শক্তি ও বিজয় বা দুর্বলতা ও পরাজয়, কোন পর্বেই, মুসলিম সমাজে এমন কোন সংকট দেখা দেয় নি যার নাম 'নারী ইস্যু'। কিন্তু পশ্চিম ও পশ্চিমা-ভাবাপন্ন পশ্চিমের মিত্ররা যখন তাদের অসুস্থতা ও সংকটগুলো নিয়ে ইতিহাসে আবির্ভূত হল, যাতে অন্যদের সাথে সাথে আক্রান্ত হল মুসলমানরাও তখনই উদ্ভূত হল সেই কল্পিত সংকট, যার নাম 'নারী ইস্যু'। যে মুসলিম সমাজ ও ডিসকোর্সগুলোতে এই বিষয়টি আলোচিত হয়, তার অধিকাংশই মূলতবিষয়টিকে গ্রহণ করেছে ধর্মহীন পাশ্চিমা অর্থে।এই সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা নির্ধারণ করা জরুরী। এখানে আমরা নারীর অধিকার ও ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের মূলনীতিগুলো আলোচনা করা হলো:

১. মূল যে দুই অংশ দ্বারা গড়ে উঠেছে মানব প্রজাতি, নারী তার একটি। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى النجم٤٥ :

অর্থাৎ 'তিনি সৃষ্টি করেছেন যুগল পুরুষ ও নারী'- (সূরা নাজম ৪৫)।

দুই অঙ্গে গড়া নফসের একটি অঙ্গ নারী।

আদি সৃষ্টি, মাঝের জীবৎকালের দায়িত্ব এবং পরিণতি, সর্ব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমমানের সঙ্গি। জীবন, সমাজ জগৎ বিনির্মাণে তারা উভয়েই অংশ গ্রহণ করে এবং আপন আপন বৈশিষ্ট অনুসারে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে। ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বাস, সাওয়াব, আযাব, কোন ক্ষেত্রেই, এবং শরীয়তে দেওয়া অধিকার ও দায়িত্ব, কোন এলাকাতেই পুরুষ ও নারীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ তায়ালাএরশাদ করেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون َ

অর্থাৎ যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ অথবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব (সূরা নাহল ৯৭)।

আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন:

إنما النساء شقائق الرجا

অর্থাৎ 'নারীরা পুরুষের অর্ধাঙ্গ' আবু দাউদ। এই সাম্য চেতনার কারণেই ইসলাম নিছক লিঙ্গের ভিত্তিতে কারো মর্যাদা নির্ধারণ করে নি বরং ইসলামের নিকট মর্যাদার পরিমাপক তাক্বওয়া। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  الحجرات

অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি সে যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকি'- (সূরা হুজরাত ১৩)।
নারী ও পুরুষের অর্থবহ কোন সমতা-ভাবনা প্রকাশ করার জন্য 'তোমরা একে অপরের অংশ'। এর থেকে সূক্ষ্ম ও অর্থবোধক কোন ভাষিক প্রকাশ থাকতে পারে না।
আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ

অর্থাৎ 'তখন তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, আমি তোমাদের নারী-পুরুষ কারো কোন আমল ব্যর্থ করব না, তোমরা একে অপরের অংশ'- (সূরা আলে ইমরান ১৯৫)।
সুতরাং মানবিকতায়, ধর্ম ও শরীয়তের বিধান মালায়, এবং আল্লাহর নিকট মর্যাদার বিচারে নারী-পুরুষ সমান।বিশেষ এক হিকমতে আল্লাহ তায়ালা নারী ও পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও শারীরিক গঠন দান করেছেন। শারীরিক গঠনের তারতম্যের কারণে নারী ও পুরুষের শারীরিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক শক্তি ও স্বভাব এক নয়। উভয়ের মধ্যে তারতম্য আছে। শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে নারী-পুরুষ অভিন্ন নয়। আল্লাহ তায়ালা পুরুষ সম্পর্কে বলেছেন:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى آل عمران٣٦ :

অর্থাৎ 'পুরুষ তো নারীর মত নয়'(সূরা আলে ইমরান ৩৬)। এবং নারী সম্পর্কে বলেছেন:

أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ الزخرف١٨ :
অর্থাৎ 'যে অলংকারের মাঝে লালিত হয় এবং যে তর্কে অস্পষ্ট '-( সূরা যুখরুফ ১৪)।

শরীয়তের কিছু বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের এই গঠনগত ও প্রকৃতিগত ব্যবধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে নারী ও পুরুষের জন্য, তাদের নিজস্ব গঠন ও প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বিধান ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। শরীয়তের বিধানদাতা আল্লাহ তায়ালা তার হিকমাত সর্বজ্ঞানী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালার অমোঘ হিকমাতের দাবি অনুযায়ী তা করা হয়েছে। কোরআনের এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ الأعراف٥٤ :

অর্থাৎ জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তারই, জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ বরকতময়'-( সূরা আ'রাফ ৪৫)। ওটা হল আল্লাহ তায়ালার মহাবৈশ্বয়িক সৃষ্টি, নির্মাণ, নির্ধারণ বিষয়ক ইচ্ছা, আর এটা হল নির্দেশ, বিচার, বিধান প্রণয়নে আল্লাহ তায়ালার দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক ইচ্ছা। নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে-সৃষ্টিজগতের স্বার্থ, পৃথিবীর নির্মাণ-কর্ষণ, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা বিধান এসবের আলোকে- এ উভয় ইচ্ছা একত্রিত হয়েছে।

২. এই অনড় বাস্তবতার উপর ভিত্তি করেই বিন্যস্ত হয়েছে ইসলামী শরীয়তের অনেকগুলো বিধান, যার অন্যতম পরিবার বিষয়ক বিধানাবলী। ইসলামের ভাবনায় পরিবার সমাজ সংগঠনের একক। পরিবারের সুসম বিন্যাস, শক্তি ও টিকে থাকার উপরই নির্ভর করে সমাজের সুস্থতা ও নিরাপত্ত্বা। পরিবার তার সদস্যদের মধ্যে প্রশান্তি, ভালবাসা ও সহমর্মিতার পরস্পর বিনিময় নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালনের লক্ষ্য স্থির করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ الروم٢١ :

অর্থাৎ 'তার অন্যতম নিদর্শন তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন সঙ্গিনী, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও। এবং তিনি তোমাদের মাঝে দিয়েছেন ভালবাসা ও দয়া'- (সূরা রুম ২১)।সমকালের পশ্চিমা জাহেলিয়্যাত নির্বোধের মত নারীর পারিবারিক ভূমিকাকে হালকা করে দেখে, তুচ্ছ মনে করে নারীর পারিবারিক এই দায়িত্বকে। যে কোন সুস্থ সমাজকে অবশ্যই এই চিন্তা মোকাবেলা করতে হবে। ইসলাম তো মনে করে পরিবার ও পরিবার সংক্রান্ত দায়িত্বগুলোই হচ্ছে মুসলিম নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

নারী যদি এই দায়িত্ব পালন করে তাহলে তাই হবে সমাজের জন্য, সবার জন্য, মঙ্গলকর।সামাজিক দায়িত্ব বন্টনে ইসলামী শরীয়ত, অপর দিকে, পুরুষকে দিয়েছে পরিবারের তত্ত্বাবধান ও অবিভাকত্বের দায়িত্বগুলো।
আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ النساء : ٣٤

অর্থাৎ 'পুরুষ নারীর দায়িত্বশীল। কারণ আল্লাহ তাদের একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এ-কারণেও যে পুরুষরা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে' (সূরা নিসা ৩৪)। আল্লাহ তায়ালা আরো এরশাদ করেন:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ البقرة٢٢٨ :

অর্থাৎ 'নারীর উপর পুরুষের যেমন তেমনি, নীতি অনুযায়ী, পুরুষের উপরও নারীরও অধিকার রয়েছে। তবে নারীদের উপর রয়েছে পুরুষদের একস্তর শ্রেষ্ঠত্ব (সূরা বাক্বারা ২২৮)
'কিওয়ামাহ' বা পারিবারিক অভিভাবকত্বের মানে ক্ষুদ্র সমাজের অর্থাৎ পরিবাবের নেতৃত্ব দেওয়া-পরিচালনা করা। স্বেচ্ছাচারিতা ও অধিপত্যকামী মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে পুরুষকে নেতৃত্বের এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই দায়িত্ব আদায়ের মাধ্যমে পুরুষ, নারী এবং পরিবারের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন পুরুষ পরিবারের আর্থিক ব্যয়ভার বহন করে, তার নিরাপত্বার দায়িত্ব নেয়, পরিবারের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। সুতরাং নেতৃত্বমূলক কোন দায়িত্ব স্বার্থকভাবে পালন করার জন্য নেতার প্রতি যতটুকো আনুগত্য জরুরী স্বাভাবিক পুরুষ তা পাবে। তবে আনুগত্য হবে কল্যাণ কাজে। ইসলাম নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশ দেয় নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

إنما الطاعة في المعروف

অর্থাৎ 'আনুগত্য হবে কল্যাণ কাজে কিংবা সঠিক বিচার অনুসারে '- (বোখারী ও মুসলিম)

৩. নারীর আর্থিক ব্যয়ভার গ্রহণ করা পুরুষের দায়িত্ব। পুরুষের সম্পত্তির একটি ভাগ, এই অধিকার বলে, নারীর প্রাপ্য। এই দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হলে পুরুষ কখনোই তা এড়াতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করনে,

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اتٰهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اتٰهَا سَيَجْعَلُ

اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ن

অর্থাৎ 'স্বচ্ছল ব্যক্তি যেন তার সচ্ছলতা অনুসারে খরচ করে। আর যার সক্ষমতা সীমিত সে যেন, আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন, তা থেকেই খরচ করে। আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তাকে যতটুকো সাধ্য দিয়েছেন তার বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। অচিরেই আল্লাহ অসচ্ছলতার পর সচ্ছলতা দান করবেন'-( সূরা তালাক ৭)। স্বামীর পক্ষ থেকে আর্থিক ব্যয় লাভ নারীর অধিকার। এবংতার নিজস্ব সম্পত্তির মালিকানা ও ব্যবহারের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। নিজস্ব সম্পত্তির মালিকানা এবং তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মত স্বাধীন, অভিন্ন ক্ষমতার অধিকারী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্তও পশ্চিমা জাহেলিয়্যাত নারীকে স্বাধীন উপার্জন এবং নিজস্ব মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার দেয় নি। রোমান আইনে নারীকে এই অধিকার দেওয়া হয় নি। উপার্জন, সম্পদের মালিকানা এবং তার ব্যবহারের ক্ষেত্রেইসলাম নারীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। এই ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোন ফারাক নেই।ইসলাম নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং তাদের পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব নির্ধারণ ও বন্টন করেছে সম্পৃরুক পদ্ধতিতে। অর্থাৎ নারী তার নির্ধারিত দায়িত্ব আদায়ের মাধ্যমে পুরুষকে সম্পূর্ণতা দান করবে অনুরূপ পুরুষ সম্পূর্ণতা দান করবে নারীকে। এই সম্পূরক কর্তব্য বন্টনের অন্যতম লক্ষ্য নারীর সান্নিধ্যে পুরুষের 'সাকান' বা প্রশান্তি লাভ এবং উভয়ের মাঝে ভালবাসা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

অর্থাৎ 'তার নিদর্শনসমূহের অন্যতম হচ্ছে তিনি তোমাদের নফস থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদের তৈরি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি পেতে পার। এবং তোমাদের দিয়েছেন ভালবাসা ও দয়া'-( সূরা রুম ২১)।

এখানে ব্যবহৃত 'সাকান' শব্দটি খুবই ব্যাপক অর্থবোধক। এই ক্ষেত্রে, এই অর্থ উৎপাদনের জন্য আরবীতে- সম্ভবত অন্য কোনো ভাষাতেও- এর চেয়ে ভাল আর কোন শব্দ নেই। শব্দটির মাঝে অনেকগুলো অর্থ একত্রিত হয়েছে, উদাহরণত নিরাপত্বা, শান্তি, প্রশান্তি, আপনত্বের অনুভূতি ইত্যাদি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে যদি এই গুণগুলো বিকশিত হয় তাহলে এর সুফল ভোগ করে, সর্বপ্রথম স্বামী-স্ত্রী নিজেই, এরপর সন্তানরা এভাবে গোটা সমাজ।

আমরা আগেই দেখিয়েছি নারী-পুরুষ সৃষ্টিগতভাবেই এক নয়। তাদের মাঝে শারীরিক ও মানসিক অনেক ফারাক আছে। নারী-পুরুষের পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলাম এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেছে এবং তাদের নিজ নিজ প্রাকৃতিক-জৈব বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতার সাথে সঙ্গতি রেখে সম্পূরক পদ্ধতিতে তাদের দায়িত্ব বন্টন ও অধিকার নির্ধারণ করেছে। মানবিক সম্পর্ক বিনির্মাণে ইসলাম ন্যায় ও ইনসাফের যে ভিত্তি দিয়েছে এটা তারই ফল।

যার যে স্বাভাবিক দায়িত্ব, সম্পূরক সমাজিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে, তাকে তার থেকে বেশী দায়িত্ব দেওয়া হলে বা স্বেচ্ছায় তার থেকে বেশী দায়িত্ব নিলে অনেক সময় তার দ্বারা সমাজ উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার কারণ তার ফলে সামাজিক সংগঠন ব্যাহত হয়। তাই ব্যক্তিগত ও সামাজিক কোন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া নারীর উপর পুরুষের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়, এক প্রকার জুলুম। এটা দায়িত্ব বন্টন ও অধিকারের সুসঙ্গতাকে নষ্ট করে। এর মাধ্যমে নারীর সম্মান বিদীর্ণ করা হয়। নারীর নারীত্বকে অপদস্থ করা হয়।

৫. ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন এবং ব্যাপকভাবে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নারীর দায়িত্ব কি, তা স্পষ্ট করা এবং সে সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে যে বিষয়টি অনিবার্য পূর্বশর্ত তা হল - শিক্ষা। তাই আমরা মনে করি, যা ছাড়া মানুষ তার রবের ইবাদত পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করতে পারবেনা-যেমন বিশ্বাস ও অনুশীলনের অনিবার্য বিষয়গুলো- সেই সব বিষয়ে শিক্ষাদান একটি অনিবার্য শরীয়তী নির্দেশ এবং সেই ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে কোন ফারাক নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

অর্থাৎ 'জ্ঞান অন্বেষণ প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ'- (ইবনে মাজাহ)

ইসলামের এই মৌলিক বিধানগুলোর বাইরের অন্যান্য বিধানের জ্ঞানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের যে নিজ নিজ ভূমিকা ও দায়িত্ব সে অনুসারে জ্ঞান অর্জন করবে। এর বাইরের যে জ্ঞান চর্চা তা নফল, তা আদায় করতে গিয়ে পার্থিব ও অপার্থিব ফরজ আমলগুলো ব্যহত করা যাবে না।

৬. ইসলাম নরীর অধিকারগুলো নির্ধারণ করেছে তার জৈব ও প্রাকৃতিক স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতি রেখে। পক্ষান্তরে জাতিসংঘ মানুষের অধিকারের যে সনদ পেশ করেছে তাতে নারীর অধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে একটি অনুরূপ সাম্যতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। ইসলাম

নারীকে যে সব অধিকার দেয় এবং জাতিসংঘের এই অধিকার সনদে নারীর জন্য যে সব অধিকারের কথা বলা হয়েছে এই দুয়ের তুলনামূলক পাঠ নিলে দেখা যাবে ইসলাম নারীকে যে সব সামাজিক অধিকার দিয়েছে তা জাতিসংঘের দেওয়া অধিকারগুলো থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিকারগুলো সম্পর্কে পশ্চিমা জাহেলিয়াত উদাসীন। তাই কোনরূপ দ্বিধা না করে সে এইগুলো এড়িয়ে যায়, অকার্যকর করেদিতে চায়। উদাহরণত বিয়ে, মাতৃত্ব, গৃহ পরিচালনা এবং পারিবারিক অবকাঠামোর মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো অনুশীলন ও বিকশিত করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, আধুনিক জাহেলিয়াতের বিধান-সনদে তা নেই।ইসলাম নরীকে স্বামী নির্বাচনের অধিকার দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে রাসূল স্বামীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দিয়ে তার সাহায্যে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দিয়েছে নারীকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه

অর্থাৎ 'যার চরিত্র ও দ্বীনদারি তোমরা পছন্দ কর, তোমাদের নিকট যদি এমন কেউ আসে তাহলে তার নিকট বিয়ে দাও'-(ইবনে মাজাহ)। কোনো কারণে দাম্পত্য জীবন যদি সংকটের মুখে পড়ে তাহলে শরীয়ত নারীকে স্বামীর সাথে না থাকার অধিকার দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে কোরআনে অনেক আয়াত ও সহীহ ও স্পষ্ট হাদীস আছে। এই বিষয়ে যে কোন বিধান সেগুলোর সাপেক্ষেই নির্ধারিত হওয়া উচিত।

নারীর সম্ভ্রম ও মর্যাদা রক্ষা ইসলামী শরীয়তের একটি বিধান। যে পাঁচটি বিষয় শরীয়তের সামাজিক বিধান গুলোর মূল, অর্থাৎ দ্বীন, মর্যাদা, আকুল, মাল, নারীর মর্যাদা রক্ষা তার অন্যতম। কোন ভাবে নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা মানে শরীয়তের বিরুদ্ধে যাওয়া, নারী-পুরুষ, পরিবার ও সমাজের অধিকার লংঘন করা। এবং তা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়ানোর অপরাধ বলে বিবেচিত হবে, যার সম্পর্কে কোরআনে এসেছে:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُو
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُون

অর্থাৎ 'যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়াতে চায় তাদের জন্য দুনিয়া আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাকর শাস্তি। আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না'- (সূরা নূর ১৯)।

ইসলামের সমাজ ভাবনা ও বিধানে এটি মৌলিক একটি বিষয়। এই মৌলিক বিষয়টিকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম অনেকগুলো বিধান দিয়েছে। যেমন ইসলাম অনেক গুরুত্বের সাথে বিয়ের বিধান দিয়েছে এবং বিয়ের চুক্তিকে বলেছে 'কঠিন প্রতিশ্রুতি'। যেমন কোরআনে এসেছে,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيظًا

আর তোমরা তা কীভাবে নেবে অথচ তোমরা একে অপরের সাথে একান্তে মিলিত হয়েছ; আর তারা তোমাদের থেকে নিয়েছিল দৃঢ় অঙ্গীকার?
(সূরা নিসা ২১)।
এই মূল বিষয়টি যেন ব্যাহত না হয় তাই ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের উপর সমভাবে যিনা হারাম করেছে। কোরআনে এসেছে:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

অর্থাৎ 'তোমরা যিনার নিকটেও যেও না। কারণ তা অশ্লীল এবং খুবই খারাপ পথ'-( সূরা ইসরা ৩২)।
যে সব বিষয় ব্যক্তি ও সমাজকে ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যায় ইসলাম তা বন্ধ করে দিয়েছে। বিবাহ বন্ধন হারাম নয় এমন নারীর সাথে নির্জন ও ঘনিষ্ট মেলামেশা-কথাবার্তা নিষিদ্ধ। সমাজে যে কোন ধরনের অশ্লীলতা ছড়ানোকে কঠিনভাবে বাঁধা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং গুরুত্বের সাথে প্রণয়ন করছে হিজাব ও এই সংক্রান্ত বিধানগুলো। এবং যারা এই বিষয়টি ক্ষুণ্ণ করে তাদের জন্যইসলাম দিয়েছে শাস্তির বিধান। এই উদ্দেশ্যেই ইসলামে যিনার কঠিন শাস্তির বিধানগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে ইসলাম নারীর সম্ভব ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়টিকে নানাভাবে গুরুত্ব দিয়েছে।সম্ভ্রম ও শালীনতা রক্ষা এবং অশ্লীলতার বিস্তার রোধের জন্য ইসলামী শরীয়ত যে কয়টি সামাজিক দূর্গ নির্মাণ করেছে তার অন্যতম হল হিজাব। কেবল তাই নয় বরং হিজাব নারী ও পুরুষের সম্ভ্রম-মর্যাদার প্রতি যত্নবান শরীয়তের অন্যতম প্রতীক।
হিজাব কোন নফল বিধান নয়। কিংবা হিজাব ঐচ্ছিক প্রতীকী কোন অনুশীলন নয় যে, কারো মনে চাইলে তা পালন করবে বা করবে না। বরং নারীর মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার একটি উপায় হিসেবে আল্লাহ নারীদের উপর হিজাব ফরজ করেছেন। এর ফলে কাম ও প্রবৃত্তির অনুসারী দুষ্টরা তাদের উত্ত্যক্ত করতে পারবে না। এটি অবশ্যপালনীয় ফরজ বিধান। নারীদের আদর্শ 'উম্মাহাতুল মু’মিনীন' এর উপরও তা ফরজ ছিল। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
الأحزاب٥٩ :

অর্থাৎ 'হে নবী আপনি আপনার স্ত্রী ও কন্যা এবং মোমেন নারীদের বলুন তারা যেন হিজাব দিয়ে ঢেকে থাকে। তাহলে তাদের চেনা যাবে না এবং তাদেরকে কেউ উত্ত্যক্ত করবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল দায়ালু'-( সূরা আহযাব ৫৯)।

ইসলামের শত্রুরা এবং প্রবৃত্তির অনুসারী ও মানুষের কামুক বৃত্তিগুলো ভাঙ্গিয়ে যারা বাণিজ্য করে তারা ইসলামী হিজাবকে খুবই নগ্নভাবে হামলা করে থাকে। আবার অনেক সমাজ ও ডিসকোর্স হিজাব গ্রহণ করে নেয়। তবে অন্তসার ও লক্ষ্যশূন্য জাতীগত একটি প্রথা হিসেবে। বাহ্যত হিজাব পালন করলেও এরা হিজাবের মিত্র নয়। হিজাবকে সরাসরি অস্বীকারের সাথে এর মৌলিক কোন তফাত নেই। দুটিই ইসলামী শরীয়ত ও হিজাবের শত্রু।কিন্তু শরীয়ার বিধান হিসেবে তো অবশ্যই, হিজাব এবং তার সাথে সম্পৃক্ত মূল্যবোধ- আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি- যে কোন মাবনীয় সমাজের সুস্থ্য জীবনের জন্যও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিশ্ব জুড়ে হিজাবের প্রতি এত বিদ্বেষ কেন? উদাহরণত পশ্চিম, বিস্ময়করভাবে, হিজাবের ক্ষেত্রে খুবই সংকীর্ণ আচরণ করে। হিজাব নিয়ে তারা খুবই শংকিত ও বিব্রত বোধ করে। আর কোন ধর্ম-সম্প্রদায় বা মানব-গোষ্ঠীর পোশাক নিয়ে পশ্চিমাকে এমন সংকীর্ণ আচরণ করতে দেখা যায় না।পশ্চিমের দেশগুলো এবং পশ্চিম আক্রান্ত ধর্ম নিরপেক্ষ মুসলিম দেশগুলোতেও আইন ও বাস্তব আচরণ, উভয় উপায়ে হিজাবকে নানাভাবে আক্রমন করা হচ্ছে। এর কারণগুলো নিয়ে ভাবলে আমাদের নিকট অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে।

হিজাব, পূর্বে আমরা প্রমাণ করেছি, ইসলামী শরীয়তের একটি মৌলিক ফরজ। ইসলাম এই বিধান দিয়েছে নারী ও সমাজের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য, নারীর সম্ভ্রমকে সমর্থন করার জন্য। শরীয়তের অপর যে বিধানটি এই লক্ষ্যের সাথে জড়িত এবং তাকে শক্তি যোগায় তা বহু বিবাহ। তবে বিকৃত প্রচারণা এবং ভুল অনুশীলন-চর্চার ফলে এই বিধান তার মূল জায়গা থেকে সরে গিয়েছে। তার আবেদন হারিয়ে ফেলেছে। বাস্তবতার পাঠ নিলে দেখা যাবে যে সমাজ, এমনকি যে সব অমুসলিম সমাজ এই প্রথার চর্চা করে তাতে নারীর মর্যাদা ও মূল্য তুলনামূলক ভাল। যাতে এই প্রথার অনুশীলন ও প্রচলন আছে এবং যা এই বিধানকে অবৈধ ও অপরাধমূলক মনে করে, এই দুই সমাজের তুলনামূলক পাঠ নিলেই এই সত্য উন্মোচিত হয়ে যাবে। দেখা যাবে দ্বিতীয় সমাজেই নারী তুলনামূলক কম মূল্য পাচ্ছে।

তাই বহু বিবাহ ইসলামী শরীয়তের একটি স্বীকৃত বিধান। ক্ষুণ্ণ নয়, এই বিধান নারীর মর্যাদাকে আরো নিশ্চিত করে। বৈধব্য, তালাক, পৌড়ত্ব/বিবাহহীনতার কারণে মেয়েদের আইবুড়ো হয়ে উঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদার সাথে বিয়ের যে সংকট দেখা দেয় বহু বিবাহ বিধান সে সংকটের সহজ সমাধান করতে পারে। বহু বিবাহ প্রথা আরো অনেক সমাজিক সংকটের তুলনামূলক সহজ ও কার্যকরী সমাধান। যেমন বন্ধাত্ব, অসুস্থতা, পেশা-প্রকৃতি কিংবা জাতীয়তার মত আইনগত সংকট। এই সব ক্ষেত্রে বহু বিবাহ ছাড়া অন্য যে সমাধানটি আছে তা তালাক, ইসলামের ভাবনায় তা নিকৃষ্টতম বৈধ বিধান, যা ইসলামের দাম্পত্য বিধানের মূল স্পিরিট- পরস্পর ভালোবাসা, মায়া-তার বিরোধী। অনেক ক্ষেত্রে বহু বিবাহ শিশুর অভিভাবকহীনতার সমাধান হয়ে থাকে। যেমন বাবা মারা-যাওয়া শিশু, বা বাবা-নিখোঁজ শিশুর ক্ষেত্রে বিকল্প পিতা-অভিভাবক তৈরি করে বহু বিবাহ কপ্রথা শিশুকে অনাথ এতীমী জীবন থেকে উদ্ধার করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَ ج رُبعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوْا

আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দু'টি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় কর যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা যুলম করবে না।(সূরা নিসা-৩)

এভাবে বিয়ের বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলাম নারী, পুরুষ তথা গোটা সমাজের কল্যাণের প্রতি সযত্ন মনযোগ দিয়েছে। এমন বিধান দিয়েছে যা উভয় পক্ষের জন্য দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্যকে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত করে এবং তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা পূর্ণ করে।

সর্বশেষে যেটা উল্লেখ করা জরুরী তা হল, প্রায়োগিক ও বাস্তব কর্মকাণ্ডের উপর- জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা ও সিদ্ধান্তের পর- জোর দেওয়া। এই ক্ষেত্রে এমন বাস্তব কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা, যা সমাজে সত্যিকার জাগরণ তৈরি করবে, ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে তার প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে এবং পশ্চিমের নারী ও সমাজ যে অসুখকর পরিণতিতে আক্রান্ত হয়েছে তা এড়িয়ে সমাজে নারীর বাস্তব উৎপাদনশীল অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করবে। এভাবে মুসলিম নারী ও সমাজ অন্যান্য সমাজের জন্য আদর্শ হওয়ার সম্মান লাভ করবে।( মুসলিম নারীর অধিকার ও দায়িত্ব ইসলামের ইশতিহার ও সনদ-ফায়সাল বিন খালেদ )

## বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

বর্তমান বিশ্বে নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হতে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘরছাড়া করেছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদার যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ণ করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শৃঙ্খলে বন্দী করে ফেলেছে।

পাশ্চাত্যবাদীরা পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে নারীদেরকে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও ৮৫% নারী ধনতন্ত্রবাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদেরকে অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারের পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছে এবং খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। যেমন- নারীদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, নারী বিষয়ক নানান অশ্লীল গল্প, কবিতা, উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যুব সমাজ এমনকি বৃদ্ধদেরও মানষিক বিকৃতি ঘটছে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারী জাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## নারীদের প্রতি ইসলামের সুবিচার:

জাহেলিয়্যাতের যুগে নারীদের প্রতি বৈষম্য ও তাদের ভোগের পণ্যে পরিণত করা হত। তাদের সমাজের বোঝা মনে করা হত। মানুষ হিসেবে সমাজে তাদের কোনো মূল্যায়ন ছিল না। যুলুম নির্যাতন ছিল তাদের নিত্যদিনের সাথী। নারী বলে জন্ম গ্রহণ করাই ছিল তাদের একমাত্র অপরাধ। প্রতিনিয়তই তারা নির্যাতিত হত পুরুষদের মাধ্যমে।তারপর যখন ইসলামের আগমন ঘটল, ইসলামই নারীদের মর্যাদার আসনে সমাসীন করলেন। তাদের সম্মান ও আত্ম-মর্যাদাবোধ তাদের ফিরিয়ে দিলেন। ইসলাম নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সহ তাদের থেকে যাবতীয় যুলুম নির্যাতন প্রতিহত করল। তাদের প্রতি পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো কী তা পলনে ইসলাম পুরুষদের বাধ্য করল। ইসলাম ছোট বেলায় কন্যা সন্তান হিসেবে, কৈশোরে বোন হিসেবে, যুবতী হলে স্ত্রী হিসেবে এবং বার্ধক্যে পৌঁছলে মা হিসেবে নারীদের যথার্থ মূল্যায়ন করল এবং তাদের উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করল। বর্তমানে অনেকগুলো প্রচার মাধ্যম, সাহিত্যিক নারীদের ছোট বেলা থেকে নিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছা পর্যন্ত ইসলাম যে অধিকার দিয়েছেন তা সম্পর্কে তাদের নূন্যতম কোনো জ্ঞান না থাকার কারণে তারা ইসলাম বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের মন্তব্য করে থাকে। অথচ ইসলাম নারীদের যে সম্মান ও অধিকার দিয়েছে, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত দুর্লভ। এ বিষয়ে কিয়দংশ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. ইসলাম নারীদের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং মানুষ হিসেবে তাদের সম্মান দিয়েছে।ইয়াহুদীরা  মনে করে নারীরা অত্যন্ত খারাপ আত্মার অধিকারী ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির। কারণ, নারীর কারণেই আদম আলাইহিস সালাম ধোঁকায় পড়ল এবং নারীই জান্নাত হতে বের হওয়া ও বিতাড়িত হওয়ার কারণ হলো। ইসলাম এ কথা সমর্থন করে না।জাহেলিয়্যাতের যুগের আরবরা গোমরাহী ও অজ্ঞতার উপর এতই মগ্ন ছিল যার কারণে তারা নারীদের অস্তিত্বই মেনে নিতে রাজি হতো না বরং নারীদের কথা শুনলেই তাদের চেহারা কালো হয়ে যেত। রাগে, ক্ষোভে ও লজ্জায় তাদের মাটিতে মিশে যাওয়ার উপক্রম আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলল,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ ج مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ الَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

"আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সে দুঃখে সে কাওমের থেকে আত্মগোপন করে। অপমান সত্ত্বেও কি একে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখ, তারা যা ফয়সালা করে, তা কতই না মন্দ"
(সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৫৮-৫৯)

অথচ আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষদের সম্মানের দিক দিয়ে তাদের উভয়ের সমমর্যাদার অধিকারী করেন। আল্লাহর মাখলুক হিসেবে তাদের উভয়ের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা তাদের দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ ع عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিস্ক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৭০]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা নারী পুরুষ সবাই যে মানুষেরই অন্তর্ভুক্ত তা তিনি নিশ্চিত করেন। নারী পুরুষ সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাদের আল্লাহ তাআলা এক আত্মা থেকেই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
يأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১]
সুতরাং প্রতিটি মুসলিম নারী এ কথা বিশ্বাস রাখবে যে,সে একজন নারী সেও একজন মানুষ। নারী হওয়াতে সে কখনোই কোনো প্রকার হীনমন্যতায় ভুলবে না।কখনোই ভাববে না যে, তার সৃষ্টি ছিল অনর্থক, তার দ্বারা জাতির কোনো উপকার হয় না এবং সে জ্ঞান বুদ্ধিতে দুর্বল। কারণ, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের জন্য যা করা উপযোগী সে বিষয় সম্পাদন

করার জন্য তাদেরকে বিশেষ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করার মাধ্যমে তাদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়েছে।যেমনিভাবে যিনি একজন পুরুষ তাকে তার জন্য প্রয়োজন ও উপযুক্ত বিষয়ে যোগ্য করে সৃষ্টি করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করেছেন, অনুরূপভাবে একজন নারীকেও তার পাওনা উপযুক্ত সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার আল্লাহ দিয়েছেন। একজন নারী যদি কোনো নেক আমল করে, আল্লাহ তাআলা তাকে একজন পুরুষের সমপরিমাণ সাওয়াব ও বিনিময় দিয়ে থাকেন। নারীকে নারী হওয়ার কারণে তার সাওয়াব ও মর্যাদায় কোনো ভাবেই কম দেওয়া হয় না। এদিক থেকে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদার অধিকারী করা হয়েছে। নারী হওয়ার কারণে তার সাওয়াব ও বিনিময়ের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ ও কম করা হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ ج مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيُوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯৭]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيهَا وَ مَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর পক্ষ

থেকে সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়। এটাই মহা-সফলতা।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭২)

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুমিন মহিলার মহান প্রতিদানের বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে বলেন,

ا منت المرأة خمسها، وضاعت شهرها، وحصنت فرجها

و اطاعت بعلها و دخلت من أي أبواب الجنة شاءته

"যখন কোনো নারী দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযান মাসের সাওম পালন করে, স্বীয় লজ্জা-স্থানের হিফাযত করে এবং সে তার স্বামীর অবাধ্য না হয়, সে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা করে প্রবেশ করতে পারবে।"(মুসনাদে আহমাদ -১৬৬১)
এর অর্থ হচ্ছে, একজন মুমিন নারীর জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথ একজন পুরুষের তুলনায় অধিক সহজ ও জান্নাতের দরজাসমূহ তাদের একেবারেই সন্নিকটে।
অনুরূপভাবে তাদের জন্য শাস্তি প্রয়োগের বিধানও পুরুষদের মতই অর্থাৎ তাদের প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্য করা হবে না। যেমন, চুরি, যিনা-ব্যাভিচার, মদপান ও অপবাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের শাস্তিও পুরুষের শাস্তির অনুরূপ। মহিলা হওয়ার কারণে তাদের বেশি শাস্তি দেওয়া হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

نواب الله لو أن فاطمة ابست محمد برفت القطعت بدعاء

"আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করে তাহলে আমি তার হাত কেটে ফেলব।"(সহীহ বুখারি-৩৪৭৫,সহীহ মুসলিম-১৬৮৮)

নারীরা অধিকারের ক্ষেত্রে, পারস্পরিক বন্ধুর ও সহযোগিতার বিষয়ে পুরুষের মতোই সমান অধিকারের অধিকারী। তাদের অধিকারের মধ্যে কোনো ঘাটতি হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭১]

নারীদের প্রতি ইসলামের সুবিচারের বহি:প্রকাশ হলো, ইসলাম যুদ্ধের ময়দানে বৃদ্ধা, শিশু ও নারীদের হত্যা করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ ছাড়া তাদের ঋতুবতী ও প্রসূতি হওয়াকালীন তাদের সাথে উঠা-বসা ও মেলামেশা করা বৈধ করেছে (সহবাস ব্যতীত)। তাদের সাথে ঐ সময় কোনো প্রকার বৈষম্য করাকে ইসলাম সমর্থন করে না। যেমনটি

জাহেলিয়াতের যুগে কত সম্প্রদায়ের লোক, ইয়াহুদীরা ও আরও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নারীদের সাথে বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য করত।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন,

وكنت أشرب من الإناء وأنا بعائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع ماء على موضع في

"আমি ঋতুবতী অবস্থায় একটি পাত্র থেকে পানি পান করতাম। তারপর একই পাত্রটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানি পান করতে দিলে, তিনি তা দিয়েই পানি পান করতেন এবং পাত্রের যে স্থানে আমি আমার মুখ রাখতাম তিনি ঠিক সে স্থানেই মুখ রাখতেন।( সহীহ মুসলিম-৩০০)

তিনি আরও বলেন,

لو كان يتكئ في حجرها وهي خالص رضي الله عنها ويقرأ القرآن.

"ঋতুকালীন সময়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোলে হেলান দিয়ে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।"(সহীহ মুসলিম -৩০১)
জিহাদ হিজরত ও ইজারার ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের অধিকার সমুন্নত রেখেছেন।
ইসলামে যেভাবে পুরুষরা হিজরত করেছে অনুরূপভাবে নারীরাও হিজরত করার সুযোগ পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَ لَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُوهُ مَا أَنْفَقُوْا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا اتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِي وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا انْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কাছে মুমিন মহিলারা হিজরত করে আসলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখ। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে অধিক অবগত। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন মহিলা, তাহলে তাদেরকে আর কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিও না। তারা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররাও তাদের জন্য হালাল নয়। তারা যা ব্যয়

করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তোমরা তাদেরকে। বিয়ে করলে তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না, যদি
তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। আর তোমরা কাফির নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখ না, তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা তোমরা ফেরত চাও, আর তারা যা ব্যয় করেছে, তা যেন তারা চেয়ে নেয়। এটা আল্লাহর বিধান। তিনি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [সূরা আল-মুমতাহিনাহ, আয়াত: ১০]

যুদ্ধের ময়দানে মহিলাদের এমন কিছু ভূমিকা রয়েছে, যা একজন পুরুষ লোকের দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয়। ফলে পুরুষের সাথে নারীরাও যুদ্ধ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

যেমন, বর্ণিত আছে উম্মে আতীইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাতটি যুদ্ধ করেছেন, তিনি তাদের সাওয়ারীর পিছনে ছিলেন, তাদের জন্য খাবার তৈরি করতেন এবং তাদের কেউ আহত হলে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন ও তাদের পট্টি লাগাতেন।

تركنا أم سليم بنت ملحان كانت حاملاً يوم حنين ومعها حنجر

بيدها فيقول لها التي صلى الله عليه وسلم ( أم سليم ؟ وتجيب : ينعم بأبي أنت وأي يا رسول الله القتل الذين ينهرمون عنك 1 قرانهم لذلك أهل ، ويسألها زوجها أبو طلحة عن المتجر الذي معها

فتقول : المحدثه إلى ذنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه

"অনুরূপভাবে উম্মে সুলাইম বিনতে মালহান রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি তখন গর্ভবতী ছিলেন। তার হাতে একটি বর্ম ছিল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উম্মে সুলাইম বলে ডাক দিলে তিনি উত্তরে বলেন হাঁ, হে রাসূল!আপনার উপর আমার মাতা পিতা কুরবান হোক। আমি যারা আপনার থেকে পলায়ন করে আসে তাদের হত্যা করব। কারণ, তারা এরই উপযুক্ত।তার স্বামী আবু তালহা তাকে তার বর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আমার নিকট দিয়ে যদি কোনো কাফের অতিক্রম করে, তখন তার পেটে আঘাত করার জন্য আমি এ লাঠি নিয়ে এসেছি।

وقل مثل ذلك في حق صفية بنت عبد المطلب يوم الأحزاب وأم عمارة وكعينة الأسلمية وخولة بنت الأزور(

"অনুরূপভাবে সুফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব আহযাবের যুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। উম্মে আম্মারা কুয়াইবাতুল আসলামিয়া খাওলা বিনতে আযওয়ার প্রমুখ নারী সাহাবীগণ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে অনেক নারীদের দেখা গেছে তারা আমানত গ্রহণ করতেন এবং বন্ধক রাখতেন। তাদের আমানত ও বন্ধক রাখাতে কোনো বাধা ছিল না, বরং তাদের আমানত রাখা ও বন্ধক রাখাও গ্রহণ যোগ্যই ছিল।

ইসলাম নারীদের শুধু পুরুষের মতই সমান মর্যাদা দিয়ে ক্ষান্ত হননি, বরং ইসলাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের পুরুষের চেয়েও অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে নারীদের নামে একটি সূরা নাযিল করেছেন। নারী যখন মা হয় তখন সন্তানের জন্য জান্নাতকে তাদের দু পায়ের তলে রেখেছেন। আর ইসলাম নারীদের সাথে সদাচরণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছে তিন বার আর পুরুষদের প্রতি দিয়েছে একবার। কোনো মহিলা সন্তান প্রসবের সময় মারা গেলে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে।

আর পুরুষের মতো নারীদেরও মতামত দেওয়া ও পরামর্শ দেওয়ার অধিকার রয়েছে। যখন তারা কোনো গ্রহণ যোগ্য মতামত দেবে তখন তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বিভিন্ন সময় পরামর্শ চাইলে তিনি তাকে বলেছিলেন;

و الله لا تحريك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصل الحديث وتحمل الكل وتقري الصيف وتعين على نوائب الحق

'আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবে না। কারণ, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক সমুন্নত রাখেন। সত্য কথা বলেন, অসহায় মানুষের সহায়তা করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার আদায়ে সাহায্য করেন।"(সহীহ বুখারি)

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার পরামর্শ গ্রহণ করে আমল করতে আরম্ভ করলে আল্লাহ তা'আলা তার পরামর্শের মধ্যে বরকত ও কল্যাণ দান করেন।

## পাশ্চাত্যে নারী অধিকারের নমুনা:

অর্থনীতিতে মূল কথা হল, ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই। প্রয়োজনের তুলনায় বাজারে সরবারহ যদি যথেষ্ট হয়, তাহলে মার্কেট রেট সব সময় স্থিতিশীল থাকে, আর যদি পণ্যের সরবারহ অপর্যাপ্ত হয়, তাহলে পণ্যের দাম বাড়তে থাকে। আর যদি প্রয়োজনের তুলনায় সরবারহ বেশী হয়, তাহলে পণ্যের দাম দ্রুত কমতে থাকে। পশ্চিমা মহিলাদের অবস্থাও অনুরূপ। পুরুষদের চাহিদার তুলনায় মার্কেটে অনেক বেশী মহিলাদের আমদানী। ফলে মহিলারা হারিয়েছে তাদের সামাজিক ভ্যালু। এক সময় পশ্চিমা সমাজে লোক দেখানোর জন্য হলেও যৌনক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বিবাহের প্রয়োজন হতো। আজ আর ওসব ঝক্কি-ঝামেলার প্রয়োজন হয় না। লিভ টু গেদারের অবদানে সব প্রয়োজন পূরণ করে নেয়া হয়। আজ পশ্চিমা নারীরা এতই অসহায় যে, স্কুল জীবন থেকে শুরু হয় তাদের উপর যৌন নীপিড়ন।যুবতী বয়সে হয় লিভ টু গেদারের শিকার। বিনিময়ে তারা কি পাচ্ছে, সারাদিন খাটছে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরছে অবসাদ আর ক্লান্তিতে চুর হওয়া শরীর নিয়ে। বাসায় ফিরে যখন তার বিশ্রামের প্রয়োজন, যখন তার আরামের প্রয়োজন, তখন তার কাজ করে দেওয়ার মতো কেউ নেই। নেই তার কোন সহযোগী। তাকেই আঞ্জাম দিতে হয় সব। এরপরও আছে সন্তান জন্ম দেয়ার বিড়ম্বনা। আছে সন্তান লালন-পালনের বাড়তি ঝামেলা। গাধার মত খাটতে হচ্ছে তার সারাটি জীবন। একদন্ড সুখের জন্য সে ছুটে চলছে দেশ থেকে দেশান্তরে। মৃত্যু পর্যন্ত সুখের সাক্ষাৎ থেকে সে হচ্ছে বঞ্চিত। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়, মাসিক ঋতুকালীন সময়, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর অসুস্থ অবস্থায়ও তাকে জীবন সংগ্রামের গ্লানি টেনে যেতে হচ্ছে অহরহ। এরপরও তার মাথার উপর নেই পিতা-মাতার ছায়া। কারণ, তারা বৃদ্ধ বয়সে হয় প্রবীণ সদনের শিকার। নেই স্বামীর সোহাগ, কারণ স্বামী বলে অনেকেরই কেউ নেই।নেই সন্তান-সন্ততির শ্রদ্ধা। কারণ, কোন সন্তানই তার মাকে নষ্ট চরিত্রের অধিকারিনী দেখতে চায় না। যে মা চরিত্রহীন, সন্তানদের কাছ থেকে তার শ্রদ্ধা পাওয়ার কথা নয়। যে সন্তান জানে যে, তার বাবা মার লাম্পট্যের অবৈধ ফসল, সে সন্তান কখনো তার বাবা মাকে শ্রদ্ধার নজরে দেখতে পারেনা।

পশ্চিম মুলুকগুলোতে ফ্যামিলি সিস্টেম নেই:

আজ পশ্চিমা সন্তানরা জানে না কি সম্মান তার মায়ের প্রাপ্য। আর কি তার বাবার হক। ফ্যামিলী সিস্টেম বলে সে সমাজে এখন আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। সে সমাজে একটি পরিবারের সংজ্ঞা হল, দু'জন পুরুষ অথবা দু'জন নারী, যারা একত্রে এক ছাদের নিচে বসবাস করে। পুরুষে পুরুষে বিবাহ অথবা নারীতে নারীতে বিবাহ সে সমাজে কোন গর্হিত বা অশ্লীল কাজ নয়। এসব কিছুই সেখানে হচ্ছে হর হামেশা, অবলীলায়। আজ সেখানে পিতার যৌন সম্ভোগের শিকার হচ্ছে তারই ঔরসজাত কন্যা। মা হচ্ছে তার সন্তানের সম্ভোগের শিকার। এরই নাম তারা সমনাধিকার দিয়েছে।

নারী অধিকারের অনেক শ্লোগান আমরা হর হামেশা শুনে থাকি। একমাত্র মার্গারেট থ্যাচার ছাড়া গ্রেট বৃটেনের ইতিহাসে আর কোন মহিলা কখনো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়নি। তাহলে পশ্চিমাদের নারীর ক্ষমতায়ন শ্লোগানের অর্থ কি? আমরা মৌলবাদীরা না হয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাই আমাদের মহিলারা হিজাব পরিধান করে এবং ঘরে থাকে। কিন্তু পশ্চিমা সুসংস্কারাচ্ছন্নরা কেন তাদের মহিলাদের ক্ষমতার শীর্ষ পদে সমাসীন করে না? আমাদের হিজাব নামক শালীন পোশাক পশ্চিমাদের কাছে মধ্যযুগীয় বর্বরতা মনে হয়। যারা সভ্যতার দাবীদার, যারা সভ্যতার ঠিকাদার, তাদের দেশের মহিলাদের সাথে এরূপ বৈষম্যমূলক আচরণের হেতু কি?
প্রতারক বুদ্ধিজীবিদের সস্তা শ্লোগানে প্রতারিত হয়ে ঘর ছাড়ার কারণে পশ্চিমা নারীদের আজ আর কোন কিছু অবশিষ্ট নেই। না আছে সতীত্ব সম্ভ্রম, না আছে ইজ্জত-সম্মান। আজ সেখানকার নারীরা পুরুষদের যথেচ্ছ ভোগের পাত্র। সামান্য ক'টি টাকার বিনিময়ে আজ সেখানকার নারীরা তাদের সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছে পুরুষদের হাতে। পশ্চিমা সমাজের পুরুষদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্ব শরীর থাকে আবৃত। অথচ সেখানকার মহিলাদের নিজের শরীরটুকু পর্যন্ত ঢাকার স্বাধীনতা নেই। তার সর্বাঙ্গ খোলা। এমনকি প্রচন্ড শীতের মৌসুমে যখন পুরুষরা হ্যাট-কোট লাগিয়ে স্যুটেড ব্যুটেড হয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে ইউরোপ-আমেরিকার শোভা বর্ধন করে ফেরে, তখনো সেখানকার মহিলাদের দেখা যায়, হাটু থেকে নিচের পুরো অংশ খোলা। কন-কনে শীতের কারণে ঠক ঠক করে কাপছে। কিন্তু তারপরও পুরো শরীর ঢাকার অনুমতি তাদের নেই। যদি কেউ ঢাকে, তাহলে সে হয়ে যাবে আনকালচার্ড, আন সিভিলাইজড, অথবা ব্যাগডেটেড।

নারী অধিকারের নামে ঘরের বাইরে বের করে সামাজিক যত ছোট কাজ সব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের ঘারে। আজ পশ্চিমা সমাজে যত ছোট ছোট কাজ সব করে মহিলারা। নারী

তার সীমানা লঙ্ঘণ করার কারণে আজ তাদের এই করুন পরিণতি। কেবল মাত্র পুরুষদের মনোরঞ্জনের জন্য এমন কোন কাজ নেই যা তারা করে না। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চলে তাদের মেকআপ। সাজ-গোজেরও অন্ত নেই। বার্ধক্য যাতে কোন ফাক-ফোকর দিয়ে প্রকাশ না পেয়ে যায়, সে জন্য দু'দিন পর পর চুল কালো করতে ভুল হয় না তাদের। আজ নারীর সতীত্ব পশ্চিমা জগতে যত সস্তা, অন্য কোন জিনিস মনে হয় তত সস্তা নয়। বড় বড় কোম্পানীর মালিকরা সামান্য কিছু পয়সা দিয়ে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ছবি নিয়ে নিজেদের পণ্য সামগ্রীতে ব্যবহার করছে। পয়সার বিনিময়ে দেহদানরত নিজেদের পণ্য সামগ্রীতে ব্যবহার করছে। পয়সার বিনিময়ে দেহদানরত অবস্থায়ও যদি কোন ছবি দেয়ার প্রয়োজন হয়, তাতেও তাদের কোন আপত্তি নেই।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তকী উসমানী তার 'জাহানে দীদাহ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি যখন আমেরিকা সফর করেন, তখন সম্ভবত এক বাসের গায়ে একটি বিজ্ঞাপন দেখতে পান। সেই বিজ্ঞাপনে কিছু মহিলার নাম-ঠিকানা লেখা ছিল, যাতে লেখা ছিল, 'প্লে উইথ আওয়ার বডিজ' আমাদের শরীর উপভোগ কর'। তকী সাহেব আরো লিখেছেন, প্রতি দিন রাস্তায় বের হলে যেখানে সেখানে রাস্তা-ঘাটে, যান-বাহনে, নারী-পুরুষের দু'চারটি অশালীণ আচরণ চোখে পড়ে।

কোন মহিলা যদি তার পরিবার-পরিজন নিয়ে ঘর কন্যায় ব্যস্ত থাকে, তাহলে এই সুন্দর জীবনকে বলা হয় আবদ্ধ জীবন। অথচ এই মহিলাই যখন সামান্য পয়সার বিনিময়ে বিমানবালারূপে হাজারো বেগানা পুরুষের সেবা করে, তখন তার এই জীবন হয় স্বাধীন জীবন। কোন মহিলা যখন তার স্বামী-সন্তান নিয়ে জীবন কাটায়, তখন তাকে আখ্যায়িত করা হয় বন্দী শালার বন্দী রূপে। অথচ এই মহিলাই যখন কোন অফিস-আদালতে হাজারো পুরুষের মনোরঞ্জন করে তাদেরই ফুটফরমাস পালন করে জীবন যাপন করে, তখন সে হয় স্বাধীন, মুক্ত আলো বাতাসের অধিকারিনী। মনে প্রশ্ন জাগে কোন পুরুষের জন্য যদি তার কর্মশালা বন্দীশালা না হয়, তাহলে কোন মহিলার জন্য তার সংসার কর্মশালা কোন যুক্তিতে বন্দীশালা হবে? ইসলাম নারীকে দিয়েছে অধিকার। দিয়েছে শালীনতা-স্বাধীনতা-সম্ভ্রম। রক্ষা করেছে তার সতীত্ব। তাকে বানায়নি ভোগের সামগ্রী।ইসলাম নারীকে দিয়েছে যথা্যথ মর্যাদা ও সম্মান।(ইসলামে নারীর মূল্যায়ন, মুফতি হিফজুর রহমান)

# নারীবাদ বনাম ইসলাম :

নারীবাদ (Feminism) একটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক আন্দোলন এবং মতবাদ যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে,নারী ও পুরুষের মধ্যে সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা।

নারীবাদের মূল বিষয়গুলো:

1. লিঙ্গ সমতা (Gender Equality): নারী ও পুরুষ যেন সমাজে সমান মর্যাদা পায় সেটাই নারীবাদের মূল দাবি।

2. নারীর অধিকার: শিক্ষা, চাকরি, রাজনীতি, সম্পত্তি, মত প্রকাশ, শরীরের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে নারীর পূর্ণ অধিকার।

3. পিতৃতন্ত্রের সমালোচনা: সমাজে পুরুষতান্ত্রিক (পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত) কাঠামো যেভাবে নারীর অগ্রগতি রোধ করে, তা চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

4. নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদা: নারী যেন নিজের জীবন নিজে নির্ধারণ করতে পারে, সেই অধিকার ও সম্মান অর্জনের প্রচেষ্টা।

মূলত নারীবাদীরা সমতা (equity) আর সমান-অধিকারকে (equality) গুলিয়ে ফেলেছে। সে বুঝতে ভুলে গেছে-সমতা মানেই দুজনের সমান হওয়া জরুরি নয়। ইনসাফ মানে উভয়কে আধাআধি বুঝিয়ে দেওয়া নয়। বরং ইনসাফ হলো প্রত্যেককে তার নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া।

সমান-অধিকারের ধারণা তার নিজের তৈরি 'মাপকাঠি'। অথচ সে মোটেও ভাবে না তার এই 'মাপকাঠি' কতটুকু সঠিক।
ইসলামের 'মাপকাঠি' একটাই। সেটা হলো-আল্লাহর আনুগত্য। তাঁর বিধানের ভিত্তি হলো-ইনসাফ বা সমতা সমান-অধিকার ইসলামি মানদণ্ড নয়। কেননা, সমান-অধিকার কখনো কখনো ন্যায়বিচার হতে পারে; আবার অন্যায়ও হতে পারে। বিপরীতে ইনসাফ কখনো অন্যায় হতে পারে না। যেখানে সমান-অধিকার প্রয়োজন, সেখানে সমান-সমান দেওয়া; যেখানে

সমতা প্রয়োজন, সেখানে একজনেরটা কমিয়ে অন্যকে বাড়িয়ে দেওয়া-এটাই ইনসাফের মূল কথা।

সুস্থ, বিবেকবান কোনো মানুষ নারী-পুরুষের মাঝে ভিন্নতা অস্বীকার করতে পারে না। তাদের মাঝে যেমন শারীরিক পার্থক্য আছে। আচরণগত ভিন্নতা আছে। শক্তি-সামর্থে তফাত আছে। আছে মানসিকতার ভিন্নতাও। এসব সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখে প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার ও দায়িত্ব বণ্টন করাই-ইনসাফ।

ইউরোপের নারীরা অধিকার-বঞ্চিত হয়ে, পুরুষের হাতে নিপীড়িত হয়ে কোনো আসমানি পয়গামের কাছে ফিরে আসেনি। উলটো তারা আশ্রয় খুঁজেছে পশ্চিমা মানব-ধর্মে; মানুষের বানানো কায়দা-কানুনে। ফলে অর্জনের খাতা রয়ে গেছে শূন্যই। নিপীড়নের এক খাঁচা থেকে বের হয়ে তারা অন্য খাঁচায় বন্দী হয়েছে-পার্থক্য এটুকুই।আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষের মধ্যকার এই ভিন্নতাগুলো সবচেয়ে ভালোভাবে জানেন। কেননা সৃষ্টি তো তিনিই করেছেন! আর বিধানও তিনি সেভাবেই দিয়েছেন।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير. ُ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি ভালো জানবেন না? তিনিই তো সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। "(সূরা মূলক-১৪)

আল্লাহতায়ালা বলেছেন যে,
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَالْقُنِتِينَ وَالْقُنِتُتِ وَ الصَّدِقِينَ وَالصُّدِقْتِ وَالصَّبِرِينَ وَ الصبِرَاتِ وَالْخَشِعِينَ وَالْخُشِعَتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقْتِ وَالصَّابِمِينَ وَ الشَّمْتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظْتِ وَ الذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ

لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।(সূরা আহযাব-৩৫)

একবার উম্মে সালামা এবং অন্যান্য সাহাবী মহিলাগণ বললেন যে, কি ব্যাপার, আল্লাহ তাআলা সর্বস্থানে মহিলাদেরকে ছেড়ে কেবল পুরুষদেরকেই সম্বোধন করেন। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হল। (মুসনাদ আহমদ, ৬/৩০১, তিরমিযী ৩২১১নং) এতে মহিলাদের মন জয় করা হয়েছে। তাছাড়া সকল আহ্কামে পুরুষদের সাথে মহিলারাও শামিল, শুধু তাদের কিছু বিশেষ আহকাম ছাড়া যা তাদেরই জন্য নির্দিষ্ট। এই আয়াত ও অন্যান্য আয়াতসমূহ দ্বারা পরিষফুটিত হয় যে, ইবাদত ও আল্লাহর আনুগত্য এবং পরকালের মান-মর্যাদায় পুরুষ ও নারীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের জন্য একই ভাবে সে ময়দান খোলা আছে এবং উভয়েই বেশি বেশি নেকী ও সওয়াব অর্জন করতে পারে। কেবল জাতিভেদে বা লিঙ্গভেদে তাদের মাঝে কোন কম-বেশি করা হবে না।

এছাড়াও কোরআনের বেশ কিছু আয়াতে যেমন পুরুষদের চেয়েও নারীকে অধিক সম্মানিত করা হয়েছে, তেমনি ছয়টি মূল হাদিস গ্রন্থ বা সিয়াহ সিত্তায়ও নারীর মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন রাসুল (সাঃ)। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন,

যার তিনজন কন্যা সন্তান হবে আর সে তাদের আবাসের ব্যবস্থা করবে, তাদের প্রতি মমতা প্রদর্শন করবে এবং তাদের ভার বহন করবে, তার জান্নাত নিশ্চিত। জিজ্ঞেস করা হল-ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি দুইজন হয়? বললেন, দুইজন হলেও। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবীগণের কারও কারও ধারণা-'যদি কেউ বলত একজন হলে? তাহলে নবীজী বলতেন, একজন হলেও।' -(মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৪২৪৭; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭৩৪৬)

এই সুসংবাদ কিন্তু তিনটির জায়গায় ১০টি ছেলের সন্তান লালনপালন করার ক্ষেত্রেও বলা হয়নি। কোরআনে কারীমের দিকে তাকালে দেখা যাবে, সেখানে সুরাতুন নিসা অর্থাৎ নারীদের সংশ্লিষ্ট সূরা রয়েছে বিশাল বড় আয়তনের। অথচ পুরুষ সংশ্লিষ্ট কোনও সূরা আলাদা করে কোরআনে নাই। নারী হিসেবে জন্মগতভাবে, সৃষ্টিগতভাবে, মর্যাদাগতভাবে পুরুষের সাথে কোনও প্রকার তারতম্য ইসলাম করেনি। বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে নারী হিসেবে তাদেরকে অধিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

নারীর অধিকার-মর্যাদা প্রশ্নে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক সম্পত্তির বন্টন নিয়ে। বিজ্ঞজনরা বলছেন, সমতার প্রশ্নে অনেকক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে নারীরা। তাই নারীর ক্ষেত্রে সমতার চেয়ে নায্যতায় বেশি গুরুত্ব দেয় ইসলাম।সবাই বাবা-মায়ের সম্পদের সমান যেন অধিকার পায় বা সমান যেন হিস্যা পায় মেয়েরা  সে কথা বলে। তো ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এ রকম সমান হওয়ার কোনও দাবি করছে কি না? বাবার বা মায়ের সম্পদে ছেলে যা পায় মেয়ে তার অর্ধেক পায় ইসলামের সম্পদ বন্টনের হিসাবে। এই একটা জায়গা ধরে আমরা যদি বলি যে ইসলাম নারীর প্রতি

বৈষম্য করেছে, তো এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ও হাস্যকর হবে। একই সাথে এই কন্যা সন্তান আরও অনেক জায়গা থেকে সম্পদ পাচ্ছে এবং এমন অনেকগুলো জায়গা আছে, যেখানে মেয়ে পাচ্ছে, ছেলে পাচ্ছেই না। শুধুমাত্র একটা জায়গা দেখেছেন, এই নারী যখন স্ত্রী হবেন তখন কিন্তু স্বামী থেকে তিনি সম্পদ পাবেন। এই নারী যখন কারও মা হবেন তখন কিন্তু সন্তান থেকেও তিনি সম্পদ পাবেন। আবার তিনি যখন স্ত্রী হিসেবে কারও সাথে বৈবাহিক জীবন শুরু করবেন তখন কিন্তু মোহরানা পাবেন। ছেলে কিন্তু সেখানে কিছুই পাবে না।

এছাড়াও মেয়েরা ইদ্দতকালীন একটি খোরশ পায়। মানে তালাক হয়ে গেলে তিন মাসের জন্য সেটা সে পাবে এবং এটা কোরআনের নির্দেশ। আরেকটা ব্যাপার কী এটা অনেকেই আমরা খেয়াল করি না বা জানি না, কোরআনের সুরা বাকারার ২৩৩ নম্বর আয়াত পড়লে দেখা যায় যে ব্রেস্টফিডিংয়ের সময় যদি কোনও কারণে তালাক হয়ে থাকে এবং মা বাচ্চাকে ব্রেস্টফিডিং করছে তখন কিন্তু একটি পারিশ্রমিক আকারে কিছু একটা খরচ তাকে দিতে হবে। ওই বাচ্চার ভরণপোষণ সবসময়ই কিন্তু পিতার কাছেই থাকবে। পিতার ওপরই ন্যস্ত থাকবে বা তার পরিবারের ওপর। কাজেই এখান থেকেও কিন্তু সে পাচ্ছে।
ইসলাম মা-বাবার দেখাশোনার বেলাতেও সমান-অধিকারের কথা বলেনি। বরং মা-কে প্রাধান্য দিয়েছে। এমনিভাবে পরিবারের খরচপত্র দেওয়া পুরুষের জন্য ফরজ করে দিয়েছে। অথচ নারী ধনী হলেও, এমনকি স্বামীর চেয়ে টাকাকড়ি বেশি থাকলেও তার ওপর পরিবারের জন্য খরচ করা আবশ্যক নয়। নারী বিপদে পড়লে তাকে উদ্ধার করা পুরুষের জন্য ফরজ করে দিয়েছে ইসলাম। এমনকি নিপীড়িত নারীর ডাকে জিহাদেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু পুরুষকে উদ্ধার করার জন্য নারীর ওপর জিহাদ ফরজ করেনি।

রেশমের পোশাক, সোনার গহনা ব্যবহার করা পুরুষের জন্য হারাম করলেও, নারীর জন্য জায়েজ রেখেছে ইসলাম। বিয়ের পর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে সন্তানকে কাছে রাখার অধিকার পুরুষকে দেওয়া হয়নি; নারীকে দেওয়া হয়েছে।

এটাই ইনসাফ। ইসলাম নারী-পুরুষের মাঝে সমতার বিধান দিয়েছে; সমান-অধিকারের নয়। তা হলে এখন একজন মুমিন-নারীর দায়িত্ব কী? তার দায়িত্ব-আল্লাহর বিধানকে খুশিমনে মেনে নেওয়া।
আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِه بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِن فَضْلِه إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

“যেসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের একদলকে অপরদলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তোমরা সেসব বিষয় পাওয়ার কামনা কোরো না। পুরুষরা যা অর্জন করে তার ভাগ তারা পাবে, আর নারীরা যা অর্জন করে তারাও তার ভাগ পাবে। (সুতরাং অপরের জিনিস না চেয়ে) তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর করুণা চাও, প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ ভালো জানেন।”(সূরা নিসা-৩২)

আল্লাহ তাআলা পুরুষের জন্য যেটাকে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, নারীর সেটা কামনা করা উচিত নয়। একইভাবে, তিনি নারীর জন্য যেটা নির্ধারিত করে দিয়েছেন, সেটার প্রতি পুরুষের লোভ থাকা উচিত নয়।নারী-পুরুষ সকলকে কে বানিয়েছেন? আল্লাহ! তাহলে বিধান দেবে কে? তিনিই! তাঁরই নির্দেশ-নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য নিজ-নিজ অংশ রয়েছে। সেই সাথে আছে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব।

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

"সুতরাং ভালো নারীরা বিনয়ী হয় এবং আল্লাহ যেভাবে (তাদের) হেফাজতে রেখেছেন, তারাও সেভাবে (স্বামীর) অনুপস্থিতিতে সবকিছু হেফাজতে রাখে।" ( সূরা নিসা -৩৪)
তার মানে, নারী, তুমি আল্লাহর দেওয়া-দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হও। তাহলে তিনি পুরুষের-হাতে-থাকা তোমার অধিকারগুলোও ঠিকঠাক আদায় করাবেন।

যার কাছে মাপকাঠির ধারণাই পরিষ্কার নয়, সে তো ক্বিওয়ামাকে খবরদারি আর চাপিয়ে-দেওয়া-শাসন মনে করবেই। তার কাছে সংসারকে মনে হবে দাসত্বের শেকল। আর যদি সে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে নেয়, সঠিক চিন্তার অনুগামী হয়,তাহলে সে বুঝতে পারবে-এই ক্বিওয়ামাই তার নিরাপত্তা, সুখ, স্বাধীনতার চাবি।
কেউ যদি এই বাস্তবতা বুঝতে পারেন, নিজের তৈরি করা 'মাপকাঠি' ছুড়ে ফেলে রবের-দেওয়া-বিধানের আনুগত্য করে, আল্লাহর শপথ-সে আর কোনো অভিযোগ খুঁজে পাবে না। সবকিছু তার কাছে সাবলীল মনে হবে। মুক্তির আনন্দে সে হেসে উঠবেন।মহান আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষ একে-অপরকে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন। কাউকেই এককভাবে প্রাধান্য দেননি। মাতৃত্ব, সন্তান-প্রতিপালন, পরিবার আগলে রাখা ও সন্তানকে আচার-ব্যবহার শেখানো-এই জায়গাগুলোতে তিনি নারীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সমাজ বিনির্মাণে নারীর এই ভূমিকাগুলো অন্য কাউকে দিয়ে পূরণ করা যাবে না এবং এক্ষেত্রে নারীর কোনো বিকল্পও নেই। কিন্তু সমস্যা হলো-পুঁজিবাদ এই দায়িত্বগুলোকে 'দায়িত্ব' বলে স্বীকৃতি দেয় না। কারণ

ওদের মন-মগজ কেবল টাকার আশপাশেই ঘুরপাক খায়। তাই যে কাজে টাকা রোজগার হয় না, জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয় না, সে কাজে ওদের আগ্রহ থাকবে কেন!অপরদিকে দিনরাত পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন, পরিবারের থাকা,খাওয়া,চিকিৎসাসহ যাবতীয় খরচের বন্দোবস্ত করা-এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা পুরুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সংসারের ভরণপোষণের দায় যেহেতু পুরুষ সামলাচ্ছে তাই অভিভাবকত্বও তাকেই দেওয়া হয়েছে। এটা কিন্তু পুরুষের অধিকার নয়, দায়িত্ব। আবার পুরুষের এই অভিভাবকত্ব নারীর অধিকার। তাই এটা তার জন্য জুলুম নয় কোনোভাবেই।

একজন মুসলিম নারীর কাছে যখন পুঁজিবাদ কিংবা বস্তুবাদের চাপিয়ে-দেওয়া খবরদারি মহান হয়ে ওঠে, আর আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব ঘৃণার বিষয় হয়ে যায়-তখন বুঝতে হবে ওই নারী রবের-দেওয়া-মাপকাঠিকে বুঝতেই পারেনি। কিংবা সে সেটাকে মনে ধারণ করেনি।

## নবী (সাঃ) এর বহুবিবাহ সম্পর্কে আলোচনা :

যে সময়ে সমগ্র আরব-অনারব নবিজি (সাঃ) এর বিরোধিতার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল, তাঁর ওপর নানা অপবাদ আরোপ করছিল; এককথায়, এই দেদীপ্যমান সূর্যের গায়ে কাদা নিক্ষেপের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিল। এসব কিছুই তারা করল কিন্তু কোনো কাফিরও কি কখনো তাঁর সম্পর্কে জৈবিক চাহিদা বা নারীঘটিত ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করেছে? অবশ্যই না। এ ক্ষেত্রে অপবাদ আরোপের সামান্যতম সুযোগও তারা পায়নি। নতুবা বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির দুর্নাম রটাতে এর চেয়ে বড় হাতিয়ার আর কী হতে পারত! যদি সামান্য অবকাশ থাকত, তাহলে আরবের কাফিররা-যাদের কাছে নবিজির ঘরের কোনো খবরও গোপন ছিল না-তিলকে তাল বানিয়ে এটাকে তাঁর দোষ হিসেবে গণ্য করত। কিন্তু তারা এতটা বোকা ছিল না যে, বাস্তবতা অস্বীকার করে নিজের কথার ওজন কমাবে।

আল্লাহভীরুতার মূর্তপ্রতীক নবিজির পবিত্র জীবন সর্বসাধারণের চোখের সামনে উপস্থিত ছিল। তারা দেখতে পাচ্ছিল যে, তাঁর যৌবনের বড় অংশই একাকিত্ব ও নির্জনতায় কেটেছে। এরপর তাঁর বয়স যখন ২১ (প্রসিদ্ধ মতে ২৫), তখন খাদিজার পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে-যিনি বিধবা ও সন্তানবতী ছিলেন এবং জীবনের দীর্ঘ ৪০টি বছর অতিক্রম করে তখন বার্ধক্যের দুয়ারে পা রেখেছেন। নবিজির সঙ্গে বিয়ের আগে তিনি আরও দুজন স্বামীর সংসার করেছিলেন এবং দুই পুত্র ও তিন মেয়ের জননী ছিলেন। নবিজির পক্ষ থেকে তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। তাঁর সঙ্গেই নবিজি (সাঃ)তাঁর যৌবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত

করেন; আর জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁর সঙ্গে কাটানোর ফলে নবিজির সকল সন্তানই তাঁর গর্ভে জন্মান।

অবশ্য খাদিজার ইনতিকালের পর নবিজির বয়স পঞ্চাশের কোটা পেরোলে তিনি আরও কয়েকটি বিয়ে করেন এবং শরয়ী বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে ১০ জন পর্যন্ত মহিলা তাঁর বিয়েতে আবদ্ধ হন। আয়েশা রা. ছাড়া যাঁদের সবাই বিধবা এবং কেউ কেউ সন্তানবতীও ছিলেন।

এসব পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ রেখে আমি এটা ধারণাও করতে পারি না যে, কোনো সুস্থ বিবেকের মানুষ নবিজির এই বহুবিয়েকে (নাউজুবিল্লাহ) জৈবিক ভোগ-লালসার পরিণতি বলে মন্তব্য করতে পারে! বাঁকা চোখবিশিষ্ট কেউ যদি নবুওয়াতের জ্যোতি ও মাহাত্ম্য দেখতে না পায় এবং তাঁর চরিত্র, কাজ, আল্লাহভীরুতা, পবিত্রতা, দুনিয়াবিমুখতা, সাধনা এবং জীবনের খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয় থেকেও চোখ বন্ধ করে রাখে, তবু এই বহুবিয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঘটনাপ্রবাহই তাকে এ কথা বলতে বাধ্য করবে যে, এসব বিয়ে নিশ্চয় জৈবিক কোনো চাহিদার কারণে ছিল না। যদি এমন হতো, তাহলে সারাটা জীবন একজন বৃদ্ধার সঙ্গে অতিবাহিত করে প্রায় ৫৫ বছর বয়সকে এ কাজের জন্য মনোনীত করা কোনো মানুষের বিবেক মেনে নিতে পারে না। বিশেষ করে যখন আরব ও কুরাইশের নেতারা নবিজির একটিমাত্র ইশারায় নিজেদের নির্বাচিত রূপসি ও সুন্দরী মেয়েকে তাঁর চরণে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল। সিরাত ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

এ ছাড়া মুসলিমদের সংখ্যাও তখন লাখের কোটায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং প্রত্যেক মহিলাই নবিজির সঙ্গী হয়ে উভয় জগতের সফলতা ও কল্যাণ লাভ করতে চাইতেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জীবনের প্রায় ৫০ বছর শুধু খাদিজার সঙ্গেই কাটিয়ে দেন; অথচ বিয়ের সময়ই খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর। খাদিজার ইনতিকালের পর তিনি যে-সকল নারীকে বিয়ে করেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া সবাই ছিলেন বিধবা এবং সন্তানের জননী। উম্মতের অসংখ্য কুমারী মেয়ে থাকা সত্ত্বেও নবিজি(সাঃ) তাঁদের বিয়ে করেননি।

নবিজির বহুবিয়ে  ইসলাম ও শরয়ী প্রয়োজনে ছিল। বস্তুত যদি নবি-সহধর্মিনীগণ না হতেন, তাহলে সেসব বিধান-যা শুধু নারীদের মাধ্যমেই উম্মতের কাছে পৌঁছানো সম্ভব ছিল-অজানাই থেকে যেত। কাজেই নবিজির বহুবিয়েকে জৈবিক লালসা আখ্যা দেওয়া নিতান্ত নির্লজ্জতা ও সত্যবিরুদ্ধ বিষয়। অন্যায়প্রীতি যদি বিবেকবুদ্ধিকে লোপ করে না দেয়, তাহলে কোনো কাফিরও এমনটি বলতে পারবে না।(সিরাতে খাতামুন আম্বিয়া)